অপরাহ্নে পূর্বাহ্নে
মোঃ হায়াত আলী
ময়ূখ প্রকাশনী

অপরাহ্নে পূর্বাহ্ন

মোঃ হায়াত আলী

ময়ূখ প্রকাশনী
ঢাকা

উৎসর্গ ঃ

"মাকে"

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। জন্মের পর মাতৃক্রোড়ে শিশুকাল, পরিবারের স্নেহমমতায় কৈশোরকাল, জীবিকা ও সমাজের কর্মব্যবস্থতায় যৌবনকাল এবং তৎপর শারিরীক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতায় প্রায় নির্বাসিত বৃদ্ধকাল অতিবাহনের পর একদিন ডাক আসে ওপারের। মানুষ চলিয়া যায় সবাইকে ছাড়িয়া।

জন্মের পর হইতেই শুরু হয় মানুষের সংগ্রাম মুখর জীবনের। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের চড়াই উৎরাই পার হইয়া মানুষ আগাইয়া নিয়া যায় তাহার জীবনকে—তাহার পরিবারকে। জীবনের দীর্ঘ পথচলায় মানুষ জ্ঞানার্জনে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করে এবং আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

আত্মতৃপ্তিতে পরিপূর্ণ আমার জীবনটাও বৈচিত্রময়। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর যে বিচিত্র রূপ আমি অবলোকনে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে আনন্দিত যেমন হইয়াছি বেদনা ভারাক্রান্ত হইয়াছি ঠিক তেমনিই।

আমার এ দীর্ঘ জীবনে আমি যে সকল নিয়ামত ভোগ করিয়াছি তাহার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে হাজার শুকরিয়া জানাই। আজ অশীতিপর এই বৃদ্ধ বয়সে আমার বিগত জীবন এবং হারাইয়া যাওয়া পরিবার পরিজনদের কিছু কথা লিখিয়া যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

আমার বর্তমান প্রজন্ম এবং অনাগত প্রজন্মের অবগতির জন্য আমার এ প্রয়াস। অনাগত দিনে আমার উত্তরসূরী যাহারা জীবনের কলতানে মুখরিত হইবে তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের এইসব কথা জানিয়া পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইবে বৈকি। তাই আজ জীবনের অপরাহ্নে বসিয়া স্মৃতিচারণ করিতেছি পূর্বাহ্নের।

একে পরিবারের ইতিহাসও বলা বলে। প্রতি প্রজন্মেই এই ইতিহাস কলেবরে বিস্তৃতি হইবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এই আশা পোষণ করিয়া কালোত্তীর্ণ শুভেচ্ছা জানাইতেছি আমর উত্তরসূরী সবাইকে।

আমার বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সবাই জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ঈমানের দৃঢ়রজ্জু ধারণ করিয়া সুখে শান্তিতে কালাতিযাপন করিবে এবং মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখিবে– এটাই আমার প্রত্যাশা।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ হায়াত আলী

১লা বৈশাখ, ১৪০৩

বংশ পরিচয়

আমাদের পূর্ব পুরুষদের বসতি ছিল পাবনা জেলার অন্তর্গত শোলাকুরা সাকতা নামক গ্রামে। (থানার নাম জানা নাই) গ্রামটি নগরবাড়ীর আনুমানিক ৪/৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিখ্যাত গাজনা বিলের দক্ষিণে অবস্থিত।

আমি যখন ছোট, পাঠশালায় পড়ি, তখন আমাদের বংশধরদের একজন, নাম হাবিল মোল্লা কিংবা কাবিল মোল্লা হইবে, ঐ গ্রাম হইতে একটি তাজি ঘোড়া নিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। তখন আমার মা ও বাবা উভয়েই জীবিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকদিন আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। পরে ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান।

আমার পিতা কোনদিনই ঐ গ্রামে যান নাই বলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু আমি কৌতুহল বশবর্ত্তী হইয়া ১৯৩২ ইং সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করার পর উক্ত শোলাকুরা সাকতা গ্রামে আমাদের বংশধরদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং বেশ কয়েক দিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে যে লোকটি ঘোড়া নিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন তিনি জীবিত ছিলেন না। বাড়ীর অন্যান্যরা আমাকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিয়াছিলেন। আমাদের বংশধরেরা এখনও ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

সম্ভবত আমার পিতার দাদা জনাব জমির উদ্দিন মোল্লা শোলাকুরা সাকতার বাড়ী ছাড়িয়া ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমাস্থিত দৌলতপুর থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ জায়গায় লোকবসতি অত্যন্ত কম ছিল এবং জমিজমার দামও খুব কম ছিল। আমাদের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের বাড়ী ছিল জনৈক জনাব মাদারী মোল্লার। শুনিয়াছি তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নাকি ১২ বিঘা জমিসহ ঐ বাড়ীটা শুধুমাত্র একটা দেশী লাউ দিয়া জমিদারের নিকট হইতে পত্তন নিয়াছিলেন বা খরিদ করিয়াছিলেন। উক্ত মাদারী মোল্লা সাহেবের স্ত্রীকে আমি খুব বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার তিন মেয়ে ছিল। নামঃ ১। ভানু বিবি ২। বাতাসী বিবি ৩। বালি বিবি। তাঁহাদের আমি দেখিয়াছি। আজ তাঁহারা কেহই জীবিত নাই।

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিক দিয়া নোয়াঈ নদী নামক একটি নদী প্রবাহিত ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

আমার দাদার পিতা জনাব জমির উদ্দিন মোল্লার দুই ছেলে ছিল। ধোনাই মোল্লা ও আদু মোল্লা। আমার দাদার নাম ধোনাই মোল্লা। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন আমাদের বাড়ির পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর জনাব সাদারী শেখের মেয়েকে। সাদারী শেখের এক ছেলে ছিল। নাম নজিবউল্লা শেখ (আমার পিতার মামা, আঃ গনির পিতা এবং বাতেনের দাদা)। উক্ত নজিবউল্লা সাহেবকে আমি দেখিয়াছি। তাঁহার তিন ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। ছেলেদের

নামঃ ১। ছমির উদ্দিন শেখ ২। বাহর উল্যা শেখ ও ৩। আব্দুল গনি শেখ। মেয়েদের নামঃ ১। আফা বিবি ২। আগরি বিবি এবং ৩। কুটি বিবি। আমি তাঁহাদের প্রত্যেককেই দেখিয়াছি। বর্তমানে তাহারা কেহই জীবিত নাই।

আমার দাদা ধোনাই মোল্লার ছিল তিন ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নামঃ ১। মানিক মোল্লা ২। হানিপ মোল্লা ও ৩। বানু মোল্লা (আমার পিতা)। মেয়ের নামঃ মতি বিবি। আমি আমার দাদা এবং চাচাদেরকে দেখি নাই। চাচা মানিক মোল্লা এবং হানিপ মোল্লা দাদা জীবিত থাকিতেই মারা গিয়াছিলেন। চাচা হানিপ মোল্লা গেন্দি বিবি নাম্নী একমাত্র মেয়ে রাখিয়া মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল গ্রামের ফুলমামুদ শেখের বড় ছেলে মহম্মদীর (মহম্মদ আলীর) সহিত। তাঁহার একটা ছেলেও জন্মিয়াছিল। উক্ত গেন্দিবিবির অসুখ হইলে তিনি আমার পিতার নিকট কমলা খাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার পিতা হাট হইতে কমলা কিনিয়া বাড়ী ফিরিয়া তাঁহাকে জীবিত পান নাই। স্নেহের ভাতিজির শেষ আকাঙ্খা পুরণে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি (আমার পিতা) এরপর অনেক বৎসর পর্যন্ত নিজে কমলা খাইতেন না। গেন্দি বিবির ছেলেটাও শিশু অবস্থায়ই মারা গিয়াছিল। উক্ত মহম্মদ আলীর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় পয়লা গ্রাম নিবাসী জনাব আবেদ সরদারের মেয়ের সহিত। বিবাহের পর মহম্মদ আলীও ঐ গ্রামে বাড়ী করিয়া বসবাস করিতেন। এখন তিনি জীবিত নাই। উক্ত পয়লা গ্রামের আমাদের সবারই অতি পরিচিত দুলান মাতবর তাঁহারই এক ছেলের নাম।

আমার ফুফু মতি বিবির বিবাহ হইয়াছিল নিজ গ্রামের এজেম উদ্দিন শেখের সহিত। তাহার তিন ছেলে ছিল। নামঃ ১। আছর উদ্দিন ২। আফাজ উদ্দিন ও ৩। কেতাব আলী। আছর উদ্দিন ও আফাজ উদ্দিন তাহাদের পিতামাতা জীবিত থাকিতেই মারা যান। উভয়েই কলেরা রোগে মারা গিয়াছিলেন। আছর উদ্দিনের কোন সন্তানাদি ছিলনা। আফাজ উদ্দিনের এক মেয়ে ছিল, নাম বিন্দু। বিবাহ হইয়াছিল আহলিয়া গ্রামে। তিনি এখন জীবিত নাই। তাঁর ছেলেমেয়েরা ঐগ্রামে আছে। কেতাব আলীর তিন ছেলেঃ ১। আব্দুল মজিদ ২। আমিন উদ্দিন ও ৩। মধু-মহিদুর রহমান এবং তিন মেয়েঃ ১। আয়শা (অপর দুই জনের নাম জানি না।) বড় মেয়ে আয়শার বিবাহ হইয়াছে গ্রামের নোকন উদ্দিন শেখের সহিত। আমাদের বাড়ীর লাগ পশ্চিমের বাড়ী।

আমার দাদার ছোট ভাই আদু মোল্লার এক ছেলে ছিল। নাম সানু মোল্লা। সানু মোল্লার তিন ছেলেঃ ১। জোসন মোল্লা ২। মেঘু মোল্লা ও ৩। তৈয়ব উদ্দিন মোল্লা। তৈয়ব উদ্দিন M.A পাশ সে এখন টাংগাইলের, কাগমারী কলেজে চাকুরী শেষে অবসর জীবন-যাপন করিতেছে।

আমার পিতা জনাব বানু মোল্লা তৎকালীন আররা কুমেদ ত্রিপুরা সুন্দরী (ভাদ্রা) মাইনর স্কুলে পড়াশুনা করিয়া ছাত্র বৃত্তি পাশ করিয়াছিলেন; ১৮০০ (আঠার শত) শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকের প্রথম দিকে। তৎকালে ঐ স্কুল ছাড়া আর কোন স্কুল ঐ অঞ্চলে ছিল না। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে আমার পিতাই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। ভবানীপুর নিবাসী বাবু নকুল চন্দ্র ভৌমিক মহাশয় আমার পিতার সহপাঠী

ছিলেন এবং তিনিও ছাত্র বৃত্তি পাশ করিয়াছিলেন। ছাত্র বৃত্তি পাশ করার পর আমার পিতা চুনাডাঙ্গা-বাচামারা গ্রামে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া ঐ এলাকার ছেলেদেরকে পড়াইতেন। তিনি ঐ গ্রামের জনৈক জনাব গোরা মোল্লা সাহেবের বাড়ীতে জায়গীর থাকিতেন বলিয়া তিনি বলিয়াছেন। ঐ সময়ে ঐ চর অঞ্চলে কোন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না বলিয়া শুনিয়াছি। বাচামারা গ্রাম নিবাসী মরহুম জনাব ধনী আহাম্মদ সাহেব বলিতেন যে বানু মোল্লা সাহেবই ঐ অঞ্চলে প্রথম শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন। উক্ত ধনী আহম্মদ সাহেব আমার পিতাকে খুবই সমীহ করিতেন। ঐ সময়ে আমার পিতা অবিবাহিত ছিলেন। আমার দুই চাচার মৃত্যু হওয়ায় আমার পিতা বাচামারা পাঠশালার মাষ্টারী ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া আসেন। সেই সময় আমার দাদাও জীবিত ছিলেন।

তাঁহার পর আমার পিতা হরিরামপুর থানাধীন কাঠালিয়া গ্রামের জনাব নবু খাঁ নামক ব্যক্তির কনিষ্ঠ মেয়েকে বিবাহ করেন। আমার নানা জনাব নবুখাঁর দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে ছিল। বড় ছেলের নাম দুখি খাঁ এবং ছোট ছেলের নাম তালে খাঁ (তালেবর খাঁ)। মেয়েদের অর্থাৎ আমার খালাদের নাম জানা নাই। উক্ত কাঠালিয়া গ্রাম পদ্মা নদী গর্ভে বিলীন হওয়ার পর বড় মামা দুখি খাঁ নালী গ্রামে আসিয়া বাড়ী করেন। তাঁহার এক ছেলে কামাল খাঁ এখনও ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছে। বড় ছেলে নয়ান খাঁ শিবালয় থানার অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামে আসিয়া বাড়ী করিয়াছিলেন। তিনি এখন জীবিত নাই। তাঁহার দুই ছেলে রহিম খাঁ ও চাঁদ খাঁ এখন ঐ গ্রামে বসবাস করিতেছে।

ছোট মামা তালে খাঁ খালিশা কোঠাদারা গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। তাঁহার ছেলে মোকসেদ আলী খাঁ এখনও ঐ গ্রামে আছে।

আমার বড় খালার বিবাহ হইয়াছিল মইশাখোলা গ্রামে। তাঁহার এক ছেলে আহাদি, মা জীবিত থাকিতে আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিতেন। তিনি এখন জীবিত নাই। তাঁহার ছেলেরা এখনও ঐ গ্রামে আছে। মেঝ খালার বিবাহ হইয়াছিল ঝিট্‌কা বাজারের দক্ষিণে গোপীনাথপুর গ্রামে। তাঁহার একমাত্র ছেলে দুদু মিঞা ১৯/২০ বৎসর বয়সে, ঠিক তাঁর বিবাহের দিন মারা যায়। তারপর আমার খালার অনুরোধে আমার খালু অন্য একটা বিবাহ করেন এবং সেই পক্ষের এক ছেলে নাম আওলাদ হোসেন এখনও জীবিত আছে এবং ঐ গ্রামেই বসবাস করিতেছে।

আমি আমার নানী, দুই মামা এবং দুই খালাকে দেখিয়াছি। আমার নানা বিবাহ করিয়াছিলেন ঘিওয়ের পশ্চিম দিকের কুস্তা গ্রামে। নানীর বাবা, দাদা বা ভাই কাহারও নাম জানিনা। তবে নানীর এক ভাইয়ের ছেলে সাহেব আলী খাঁ (সাবাস খাঁ মুন্সী) আমার মা ও পিতা জীবিত থাকিতে আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। তিনি এখন প্রয়াত। তাঁহার ছেলে আফছার উদ্দিন খাঁ (পাকিস্তান আমলে নেভীতে চাকুরী করিতেন) এখন ঐ গ্রামে আছেন। তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে ডকটর আব্দুল আজিজ খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। ছোট ছেলে আবদুর রহিম খাঁ M.B.B.S ডাক্তার। তিনি বর্তমানে লন্ডনে আছেন।

আমাদের জন্মের পূর্ব্বে আমার পিতা ও তাঁহার মামা জনাব নজিবুল্যার সাথে মামা ভাগিনাসুলভ স্বাভাবিক এবং অতি মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। নজিবুল্যা সাহেবই গ্রামের মাতবর ছিলেন। ঐসময়ে একটা ঘটনা ঘটে; ঘটনাটা এই প্রকারঃ- উক্ত জনাব নজিবুল্যা শেখের বড় মেয়ে আফা বিবির সহিত জনাব আদুমোল্লার (আমার দাদার ছোট ভাই) ছেলে জনাব সানু মোল্লার বিবাহের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবটি নজিবুল্যা সাহেব নিজেই করিয়াছিলেন। তখন আদু মোল্লা সাহেব জীবিত ছিলেন। তিনি নজিবুল্যা শেখের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার ছেলে সানু মোল্লার বিবাহ তালুকহাপানিয়া গ্রামে ঠিক করেন। উক্ত কারণে নজিবুল্যা শেখ খুব অপমানিত বোধ করেন। তখনকার প্রথানুযায়ী বিবাহ উপলক্ষে গ্রামের সকল লোকজনকে জিয়াফত (ভোজ) দিতে হইত এবং গ্রামের মাতবরগণই ইহার ব্যবস্থা করিতেন।

উক্ত বিবাহে নজিবুল্যা শেখ কোন সহায়তা (মাতবরী) না করায় আমার পিতাকেই এই বিবাহ উপলক্ষে জিয়াফত এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। তিনি জিয়াফতের জন্য হাট হইতে শুধুমাত্র বোয়াল মাছ কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কেহ কেহ বোয়াল মাছ খাইতেন না বিধায় অন্য প্রকার মাছের প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সরকারী খাল হইতে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নজিবুল্যা শেখ খাল হইতে মাছ ধরিতে বাঁধা দেন। তখন আমার পিতার সহিত তাঁহার মামা নজিবুল্যা শেখের সহিত ভীষণ ঝগড়া হয় এবং বলপূর্ব্বক মাছ ধরিয়া জিয়াফতের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। পরে উক্ত খালের পূর্ব্বদিকের অংশ আমার পিতা এবং পশ্চিম দিকের অংশ নজিবুল্যা শেখ জমিদারের নিকট হইতে পত্তন নেন। এই বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া দুই মামা ভাগিনার মাঝে এক সুউচ্চ প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে তাঁহারা দুইজনে কেহই কাহারও সহিত কথা বলিতেন না এবং কেহই কাহারো বাড়ীতে যাইতেন না এখন কি পরবর্তীতে আমরাও নয়। নজিবুল্যা শেখের মৃত্যুর ৩/৪ বৎসর আগ পর্য্যন্ত এই প্রকার মন কষাকষি বিদ্যমান ছিল। পরে এই অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হইয়াছিল।

আমার পিতা একজন ধার্ম্মিক এবং ন্যায়নিষ্ঠাবান সৎচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সমস্ত রকম দুনীর্তির উর্দ্ধে ছিলেন, তাই আমাদের অঞ্চলের সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন।

আমরা তিন ভাইঃ ১। বরকত আলী, আমি ২। হায়াত আলী ও ৩। হোসেন আলী এবং তিন বোনঃ ১। দুলজান (দুলি) ২। রহিমা (বরনী) ও ৩। বাচাতন। আমাকে ছোটবেলায় ফন্‌কু এবং কেহ কেহ "ফকু" ব'লিয়া ডাকিত। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বরকত আলী, তাহার পর বোন দুলী, তাহার পর আমি হায়াত আলী, তাহার পর বোন রহিমা, তারপর ভাই হোসেন আলী এবং সবচেয়ে ছোট বোন বাচাতন।

আমার বড় ভাই বরকত আলী মারা গিয়াছেন ১৯৭০ ইং সনের আগষ্ট মাসে। তাঁহার তিন ছেলেঃ ১। সিদ্দিক, ২। আমজাদ আলী ও ৩। খলিল এবং চার মেয়ে ১। রাবেয়া ২। আফিয়া ৩। গুদা বুরী (ডাক নাম) এবং ৪। সাফিয়া।

আমার পিতা তাঁহার বড় ছেলের স্ত্রীকে ৬ বিঘা জমি রেজিষ্ট্রারী দলিল সূত্রে দান করিয়া গিয়াছিলেন। বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সিদ্দিক কুঅভিপ্রায়ের বশবর্তী হইয়া ঐ ৬বিঘা জমি তার মায়ের মৃত্যুর পর যাহাতে বোনেরা অংশীদার না হইতে পারে সেই জন্য তাহার মাকে দিয়া ঐ জমি বাতেন এবং অন্যান্যদের নিকট বাজার মূল্য হইতে কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া এবং তাহাদের অংশের সব জমিজমা বিক্রয় করিয়া তাহার অপর দুই ভাই সহ মাকে লইয়া শিবালয় থানার অন্তর্গত বাসাইল গ্রামে গিয়া বাড়ী করে। এখন তাহারা ঐ গ্রামেই বসবাস করিতেছে। ঐ জমি আমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলাম কিন্তু সিদ্দিক আমাকে দেয় নাই। বলিতে গেলে তাহারা তিন ভাই এখন মানবেতর জীবন যাপন করিতেছে। সিদ্দিকের মাতা ১১/৭/৯২ইং, ২৭শে আষাঢ় ১৩৯৯ বাং বেলা অনুমান ১২টার সময় বাসাইল গ্রামে মারা গিয়াছেন। তিনি একজন অত্যন্ত সহজ সরল প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।

ছোট ভাই হোসেন আলীর চার ছেলে এবং তিন মেয়ে। ছেলেদের নামঃ ১। গোলাপ (গোলাম হোসেন) ২। আবুল হোসেন ৩। সাহ্জাহান ও ৪। জাহাঙ্গীর। মেয়েদের নামঃ ১। শোভা (গেদী) ২। মনি ও ৩। সেলিনা। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে এবং ছোট দুইজন লেখাপড়া করিতেছে। হোসেন আলী আমাদের গ্রামের বাড়ী ভবানীপুরেই বসবাস করিতেছে।

আমার বড় বোনের দুই মেয়েঃ ১। তজিরম ও ২। সালেহা। প্রথম জনের বিবাহ হইয়াছে তালুকনগর ও ছোটজনের বিবাহ হইয়াছে মেঘনা গ্রামে। তাহারা উভয়েই জীবিত আছে।

আমার দ্বিতীয় বোন রহিমার বিবাহ হইয়াছিল সিধুনগর নিবাসী রিয়াজউদ্দিনের সহিত। রহিমা অনেক দিন হয় মারা গিয়াছে। তাহার এক মাত্র ছেলে আব্দুল মোতালেব প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করিত। এখন অবসর গ্রহণ করিয়া উক্ত সিধুনগর গ্রামেই ছেলে মেয়ে নিয়া বসবাস করিতেছে।

ছোট বোনের এক মেয়ে। তাহার বিবাহ হইয়াছে উলাইল গ্রামে। আমার বোনেরা এখন কেহই জীবিত নাই।

এখন হারাইয়া যাওয়া কয়েকজন আত্মীয়ের কথা বলিতেছিঃ-

১। তালুকনগর গ্রামের জনৈক মুন্তি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আমার পিতামাতা জীবিত থাকিতে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমার পিতা তাঁহাকে ভাই ডাকিতেন। সম্ভবত তিনি আমার পিতার ফুফাতো ভাই হইতেন। উক্ত মুন্তি খাঁ সাহেবের এক ছেলের নাম ছিল রমজান আলী খাঁ। তিনিও জীবিত নাই। তাঁহার বংশের কেহ এখন ঐ গ্রামে আছে কিনা জানিনা।

২। গয়হাটা গ্রাম নিবাসী গোলদার খাঁ নামক এক ব্যক্তি একবার আমাদের বাড়ীতে একটী বন্দুক নিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দুক দ্বারা কয়েকটী পাখীও শিকার করিয়া আনিয়াছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে চাচা সম্বোধন করিতেন। শুনিয়াছি তিনি একজন ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩। উক্ত গয়হাটা গ্রামেরই অপর একজন লোক নাম মুনার খাঁ। তাঁহার সর্ব্বশরীরে ভেড়ার লোমের মত লোম ছিল। ছোট কালে তাঁহাকেও আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতে দেখিয়াছি। তিনি আমার পিতাকে ভাই এবং মাকে ভাবী সম্বোধন করিতেন। তাঁহার এক বোনের বিবাহ হইয়াছিল নন্দির বাদা গ্রামের জনাব আব্বাছ আলী মোল্লার সহিত। তাঁহার ছেলে ইস্‌মাইল মিঞা এখনও জীবিত আছে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ আমাদের পুরাতন আত্মীয় বটে; কিন্তু আত্মীয়তার সূত্র আমার জানা নাই। তাঁহারা এখন হারাইয়া গিয়াছেন। কালের স্রোতে আরও কত যে আত্মীয় স্বজন ভাসিয়া গিয়াছেন তাহার খবর কে রাখে?

নিজের কিছু কথা

এখন আমার নিজের কিছু কথা (যতদুর মনে আছে) লিখিতে চেষ্টা করিব। আমার জন্ম তারিখ লেখা নাই। পিতামাতার নিকট হইতে তাহা জানিয়াও রাখি নাই। তাই বর্তমানে আমার সঠিক বয়স কত তাহা বলা কঠিন।

বাংলা ১৩২৬ সনে, ৭ই আশ্বিন আমাদের দেশের উপর দিয়া দীর্ঘস্থায়ী এক প্রচন্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে বহু জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ঝড়ের কথা আমার কিছুকিছু মনে আছে। তখন আমার বয়স অনুমান ৭/৮ বৎসর হইবে। এই সূত্র ধরিয়া হিসাব করিলে আমার জন্ম বাংলা ১৩১৮ সনে হইয়াছে বলিয়া ধরা যায় এবং আমার বর্ত্তমান বয়স (বাং ১৪০৩ সালে) ৮৬ বৎসর হইবে। অন্যদিকে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট অনুযায়ী ইংরেজী ১৯৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী আমার বয়স ছিল ২০ বৎসর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আমার বয়স আনুমানিক ২৩ বৎসর হইবে। এই সূত্র ধরিয়া হিসাব করিলেও পূর্ব্ব হিসাবের সমর্থন মিলে। অর্থাৎ আমার বর্ত্তমান বয়স (ইংরেজী ১৯৯৬ সনে) ৮৬ বৎসর।

আমার বয়স যখন ৭/৮ বৎসর; তখন এখনকার মত লেখাপড়া শেখার এত সুযোগ সুবিধা ছিল না এবং শিক্ষার প্রতি লোকদের বিশেষ করিয়া পাড়াগ্রামের লোকদের আগ্রহও ছিল খুবই কম। তখন আজকালের মত নির্দ্দিষ্ট কোন সরকারী বা বেসরকারী পাঠশালাও ছিল না। আমাদের দৌলতপুর থানার এলাকায় কোন হাইস্কুল বা মাইনর স্কুলও ছিল না। বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই এক জায়গায় মাত্র দুই একটি পাঠপালা ছিল। ভাদ্রায় "আররা কুমেদ ত্রিপুরা সুন্দরী" নামে একটি মাইনর স্কুল ছিল। আরও একটী মাইনর স্কুল ছিল ঘিওরে। ইহা ছাড়া অপর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐ এলাকায় ছিল না।

আমাদের গ্রামের আবদুল গনির বাড়ীর কাচারী ঘরে কিছুদিন পাঠশালা ছিল। মাষ্টার ছিলেন ভবানীপুরের বাবু সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (তারাপদ চক্রবর্ত্তীর পিতা)। ঐ পাঠশালাতেই আমি সর্বপ্রথম ভর্ত্তি হইয়া লেখাপাড়া আরম্ভ করি। আমার খুব ভালভাবে মনে আছে যে আমার বড়ভাই বরকত আলীর পরিত্যক্ত একখানা রামসুন্দর বসাককৃত বাল্য শিক্ষা বই দিয়া আমি পড়া আরম্ভ করি। ঐ বইয়ের উভয়দিকের মলাটের পাতাই ছেঁড়া ছিল। ঐ একই বই পড়িয়া আমি বাল্য শিক্ষার পড়া শেষ করি। উক্ত বাল্য শিক্ষা বই আগাগোড়া পড়িতে পারিলে, বাংলা ভাষায় লিখা যেকোন বই পড়িতে পারা যাইত। আমরা প্রথমে কলার পাতায় লিখিতাম। কলার পাতায় অন্যেরা অক্ষর আঁচড় দিয়া লিখিয়া দিলে পরে আমরা ঐ লেখার উপর বাঁশের কঞ্চি দ্বারা তৈরী কলম দিয়া হাত ঘুরাইতাম এবং ঐ অক্ষরের উপর কালি দিতাম। কালি বানান হইত সাধারণত দেশী লাউয়ের পাতা রান্না করা পাতিলের তলায় ঘষিয়া।

আমরা তালের পাতায়ও লিখিয়াছি। ময়ুরের পাখার কলম ও কঞ্চির কলম দ্বারা কিছুদিন লেখার পর; ভালভাবে লেখা শিখার পর কাগজে ও শ্লেটে লিখিতাম।

এই পাঠশালায় আঃ গনি, আমার ফুফাতো ভাই কেতাব আলী, ভবানীপুরের কয়েকজন এবং ধামসর গ্রামের কয়েকজন ছাত্র পড়িত। সর্ব্বমোট ছাত্র সংখ্যা অনুমান ১৫/২০ জনের বেশী ছিল না। উক্ত পাঠশালা কিছুদিন চলার পর আঃ গনির পিতা জনাব নজিব উল্যা সাহেব তাঁহার কাচারী ঘরে পাঠশালা চালাইতে অমত করায় উহা উঠিয়া যায়।

এই সময়ে বহরাগ্রাম নিবাসী জনাব আরিপ মোল্লা সাহেবের কাচারীঘরে ইয়ারপুর গ্রাম নিবাসী বাবু দুর্য্যোধন সরকার মহাশয় এক পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি তখন ঐ পাঠশালায় ভর্ত্তি হই। দুর্য্যোধন সরকার মহাশয় সকালবেলা এই পাঠশালায় পড়াইতেন এবং ১০টায় মান্দারতা নামক গ্রামের পাঠশালায় পড়াইতেন। আমাদের গ্রামের আঃ গনি, আমার ফুফাতো ভাই কেতাব আলী, ভবানীপুরের যোগেশ ভৌমিক, দীনেশ ভৌমিক প্রমুখ এবং বহরা গ্রামের আজিম সেখের ছেলে সৈয়দ আলী; আদারী মোল্লা এবং ঐ গ্রামের আরও ছাত্র ঐ পাঠশালায় পড়িত। ছাত্র সংখ্যা অনুমান ২০/২৫ জন ছিল। বলাবাহুল্য কোন পাঠশালায় ছাত্রদের বসার জন্য কোন বেঞ্চ ছিল না। বাঁশের খুটির উপর তক্তা পাতিয়া ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা করা হইত।

ঐ সময়ে হিন্দু মুসলমান সবাই ধুতি পড়িত। আমরা সবাই ধুতি পরিয়া পাঠশালায় যাইতাম। ছাত্রেরা সবাই নগ্ন পায়ে যাইত; কেহই জুতা পায়ে দিয়া পাঠশালায় যাইত না। তখন আজকালের মত স্যান্ডেলের প্রচলন ছিল না।

৩/৪ বৎসর পাঠশালায় পড়িয়াও পাঠশালার গন্ডি পার হইতে পারি নাই। তখন তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠশালায় পড়ানো হইত। পরীক্ষায় পাশ করা সত্ত্বেও আমাদেরকে ঐ একই শ্রেণীতে রাখিয়া দেওয়া হইতেছিল।

ইংরেজী ১৯২৪ সনে আমার পিতা এবং ভবানীপুরের দীনেশ ভুইয়ার পিতা বাবু নকুল চন্দ্র ভুইয়া মহাশয় আমাদেরকে তেরশ্রী হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। আমাকে, দীনেশকে এবং যোগেশকে সঙ্গে করিয়া আমার পিতা ও নকুল ভুইয়া মহাশয় ধান গৌরীর (তেরশ্রী) বাবু হারান চন্দ্র সিংহের (জীতেন বাবুর পিতা) বাড়ীর উপর দিয়া তেরশ্রী হাইস্কুলে যাওয়ার পথে উক্ত হারান বাবু তাঁহার বাড়িতে অবস্থিত পাঠশালায় আমাদেরকে ভর্তি করিয়া দিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে এই পাঠশালায় এক বৎসর পড়ার পর আগামী বৎসর ইহারা হাই স্কুলে যাইয়া ক্লাশ ফোরে ভর্তি হইতে পারিবে। তখন ঐ বাড়ীর সম্পূর্ণ বেড়া বিহীন একখানা চার চালা ছোনের ঘরে পাঠশালা ছিল। মাষ্টার ছিলেন কুষ্টিয়া নিবাসী বাবু বিজয়চন্দ্র সরকার এবং পয়লা নিবাসী জনাব জমশের আলী মিঞা (আবুর নানার বড় ভাই)। হারান বাবুর পরামর্শমত আমাদের তিন জনকে ঐ পাঠশালায় তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করানো হইল ইং ১৯২৪ সনে। পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল। বিজয় বাবু খুব কড়া মাষ্টার ছিলেন। ছাত্ররা পড়া ভালভাবে না শিখিয়া গেলে তিনি বেত দিয়া পিটাইতেন। কাজেই পাঠশালার পড়াশুনা বেশ ভালই হইতো। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরই দীনেশের মামা বাবু রামগতি সরকার দীনেশকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তখন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। পরবর্তী বৎসর বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাদিগকে হাই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে বলা হইল।

১৯২৫ ইং সনের জানুয়ারী মাসে আমি এবং যোগেশ তেরশ্রী হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে যাই। সঙ্গে আমার পিতা এবং ভবানীপুরের বাবু সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ঐ সময়ে তেরশ্রী হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া আমাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া নিতে চাহিলেন। কারণ আমরা ইংরেজী জানিতাম না, বাংলা এবং অঙ্ক ভাল জানিতাম। যোগেশ তৃতীয় শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইল। কিন্তু আমি চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য জেদ্ ধরিলাম। তখন হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন যে "তুমি চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কিনিয়া ২/৩ মাস পড়িতে থাক, এরপর যদি শ্রেণী শিক্ষকগণ মনে করেন যে তুমি চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত তাহা হইলে তোমাকে ঐ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইবে; নতুবা তোমাকে তৃতীয় শ্রেণীতেই ভর্ত্তি হইতে হইবে।" এরপর আমি ভর্ত্তি না হইয়াই ৪র্থ শ্রেণীর বই কিনিয়া নিয়মিত ক্লাশ করিতে থাকি।

মাস দুইপর শ্রেণী শিক্ষকগণের অভিমত লইয়া আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। এইভাবে আমি তৃতীয় শ্রেণীর গন্ডি পার হই। তারপর দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত আর কোন শ্রেণীই আমাকে এক বৎসরের বেশীকাল আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আমাদের ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ছিল অনুমান ২৫/৩০ জন। ছাত্র বেতন ছিল আট আনা প্রতিমাসে। ক্লাশ ফোরে পড়ার সময় এক বৎসর আমাকে বেতন দিতে হইয়াছিল। চতুর্থ শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণীতে উঠার সময় পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হওয়ায় আমার স্কুল বেতন সম্পূর্ণ মওকুফ হয় এবং ৫ম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত আমি একজন

অবৈতনিক ছাত্র ছিলাম। আমি ৫ম শ্রেণী হইতে ২য় হইয়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ১ম হইয়া ৭ম শ্রেণীতে, ৭ম ও ৮ম হইতে ২য় হইয়া ৮ম ও ৯ম শ্রেণীতে প্রমোশন পাই। ৯ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার সময় মাত্র একদিন পরীক্ষা দেওয়ার পরই আমি ভীষণভাবে ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আর কোন পরীক্ষা দিতে পারি নাই। তবে আমাকে ১০ম শ্রেণীতে উন্নীত করা হইয়াছিল।

১৯৩১ সনে যখন আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন ভাদ্র মাসে আমার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর সঠিক তারিখ আমার মনে নাই। মা মারা যাওয়ার পর আমি স্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল কান্নাকাটি করিতাম এবং পরে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। তখনকার দিনে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব ছিল অতি প্রবল। একবার এই জ্বর হইলে সহজে ভাল হইত না এবং বহুলোক মাসের পর মাস ভূগিয়া ভূগিয়া মারা যাইত। চৌদ্দ ছটাকী বোতলে “ডিগুপ্ত” নামক এক প্রকার ম্যালেরিয়ার অতি কার্য্যকরী ঔষধ পাওয়া যাইত। ইহা অত্যন্ত তিতা ছিল। দাম ছিল একটাকা চারি আনা। অনেকেরই ইহা কেনার মত সামর্থ ছিল না।

অসুস্থতার দরুণ আমি স্কুলে যাইতে পারিতাম না এবং পড়াশুনাও করিতে পারিতাম না। আমার ১৯৩২ইং সনের মার্চ্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা কিন্তু আমি টেষ্ট পরীক্ষা দিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় ঐ বৎসর উক্ত পরীক্ষা দেওয়ার কথা আমি চিন্তাও করি নাই।

আমার সহপাঠী যাহারা টেষ্টপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহারা সকলেই যথাসময়ে পরীক্ষার ফিস দাখিল করিয়া ফর্ম পূরণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমি পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করিতে না যাওয়ায় হেডমাষ্টার মহোদয় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ দেন।

আমি অসুস্থ শরীরে তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি এবং অন্যান্য শিক্ষক মহোদয়গণ আমাকে পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করিতে বলেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে তুমি অসুস্থতার দরুণ লেখা পড়া করিতে পার নাই জানি, তবুও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তুমি পরীক্ষা দিলে নিশ্চয়ই পাশ করিতে পারিবে। একটা বৎসর নষ্ট করিও না। একটা বৎসরের মূল্য অনেক। আগামী কালই ফর্ম পূরণ করার শেষ তারিখ কাজেই আগামী কালের মধ্যেই তোমাকে ফি দাখিল করিয়া ফর্ম পূরণ করিতে হইবে। পরীক্ষার ফিস ১৫ টাকা এবং সেন্টার ফি দুই টাকা, মোট ১৭ টাকা দাখিল করিতে হইবে বলিয়া আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইল।

বাড়ী আসিয়া আমার পিতার নিকট সব বলিলে তিনি তখনই ইয়ারপুর গ্রামে গিয়া ঐ গ্রামের গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তির নিকট আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকের ৪৫ শতাংশ জমি গিরবী রাখিয়া তাহার নিকট হইতে ২৫ টাকা নিয়া আসিলেন। পরের দিন আমি ১৭ টাকা দাখিল করিয়া পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করিলাম। ঐ জমিটা নাককুর ক্ষেত নামে পরিচিত। পরবর্তীতে আমার ফুফাতো ভাই কেতাব আলী (মজিদের পিতা) ঐ ২৫ টাকা উক্ত

গঙ্গাধরকে দিয়া দিলে আমার পিতা ঐ জমি খন্ড তাঁহাকে দিয়া দেন। উক্ত জমি এখনও কেতাব আলীর ভোগ দখলে আছে।

পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করার পরেও আমার শরীর সুস্থ হয় নাই। এরপর আমার সর্ব্ব শরীরে ভীষণ পাঁচড়া উঠে এবং সব সময়েই শরীরে জ্বর থাকিত। পাঁচড়ার জন্য আমি হাত দিয়া ভাত পর্য্যন্ত খাইতে পারিতাম না। চামিচ দিয়া ভাত খাইতে হইত। এই অবস্থা কিছুদিন চলার পর পাঁচড়া সারিয়া যায় এবং আমি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠি।

সময়তো আর কাহারও জন্য অপেক্ষা করেনা, তাহার নিজ গতিতে চলিতে থাকে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার নিদ্দিষ্ট সময় আগত প্রায়। ১৯৩২ ইং সনের মার্চ্চমাসে (তারিখ মনে নাই) পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মানিকগঞ্জ আসিলাম, আগামী দিনই পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পাঁচথুবী গ্রামের জহরদ্দিন নামক এক ব্যক্তি (সে চৌকিদারী চাকুরী করিত) একটা ট্রাংঙ্ক যাহার ভিতর কিছু বই পত্র এবং সামান্য বিছানা ছিল এবং একটা হারিকেন বহন করিয়া আমার সাথে আসিয়াছিল। ঐ সময়ে হাটিয়া আসা ছাড়া মানিকগঞ্জ আসার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের বাড়ী হইতে মানিকগঞ্জ অনুমান ৯/১০ মাইল হইবে। দুর্বল শরীরে এতদীর্ঘ রাস্তা হাটিয়া মানিকগঞ্জ পৌঁছাইয়া আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি। পরের দিন অর্থাৎ যেদিন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে সেদিন সকাল বেলা ডাক্তার বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট যাই। তাঁহার বাড়ী পূর্বে চক্‌মির পুর গ্রামে ছিল এবং তিনি আমার পিতার একজন বিশিষ্ট ব্ন্ধু ছিলেন।

তাঁহার বাসা ছিল মানিকগঞ্জ বর্ত্তমান দুধবাজারের ঠিক পশ্চিমে দিকে। তিনি কিছু নাকাসুরে কথা বলিতেন। পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আমাকে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া একটা শিশিতে মিক্‌চার ঔষধ দিলেন এবং অসুখ ভাল না হইলে আবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। তিনি ঔষধের দাম বা ভিজিটের টাকা নেন নাই। ঔষধ খাইয়া কিছু সুস্থ বোধ করিলাম এবং পরীক্ষা দিতে লাগিলাম।

তখনকার দিনে মোট ৭টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইত। বাংলা-১ পেপার, ইংরেজী-২ পেপার, অংক-২ পেপার ও দ্বিতীয় ভাষা ফার্সি বা সংস্কৃত-২ পেপার। যাহারা অংকে কাঁচা তাহারা এডিশানাল অংক না নিয়া ইতিহাস নিত। আমার এডিশনাল অংক ছিল। সাধারণত বুধবার হইতে পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বুধবার দুইবেলা দুই পেপার, বৃহস্পতিবার দুই পেপার, শুক্রবার দুই পেপার এবং শনিবার এক পেপার পরীক্ষা হইল। শনিবার দিন উক্ত জহরদ্দিনকে আবার মানিকগঞ্জ পাঠান হইয়াছিল। ঐ দিন এক বেলা পরীক্ষা দিয়া জহর উদ্দিনের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসি। গরপাড়া গ্রামের ভিতর দিয়া বাড়ী ফেরার পথে এক বাড়ীতে পানি খাইতে চাহিলে বাড়ীর মালীক অত্যন্ত সুপাচ্য এক পেয়ালা পায়েস এবং এক গ্লাস পানি দিয়াছিলেন। ঐ বৎসর (১৩৩২) খুব সম্ভব আগষ্ট মাসে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া ছিল।

আমার সহপাঠী পাঁচথুবী গ্রামের যাদব দাস মহাশয়ের পুত্র গুপ্তপ্রসাদ দাস আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সংবাদ দেয় যে পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে এবং সে পাশ করিয়াছে কিন্তু রোল নম্বর মনে না থাকায় সে আমার সম্বন্ধে জানিতে পারে নাই। ঐ সময় স্কুল বন্ধ ছিল। আমি তখনই তেরশ্রী যাইয়া তদানিন্তন স্কুলের সেক্রেটারী এবং তেরশ্রী জমিদার বাড়ীর ম্যানেজার বাবু শৈলজা নন্দন মহলানবীশ মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে আমি পাশ করিয়াছি কিন্তু ফল সন্তোষজনক নয়। পূর্ব্ববর্ত্তী অসংখ্য প্রতিকুলতার ভিতর পরীক্ষা দিয়া পাশ করার আশাটাই দুরাশার নামান্তর তাই এতে দুঃখ করার কিছুই ছিল না।

ঐ বৎসর আমি ছাড়া তেরশ্রী হাই স্কুল হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলেনঃ-

১। জনাব ইমান আলী খাঁ, পিতা-জনাব গুমান খাঁ মুন্সী, গ্রাম-দৌলতপুর।

২। জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী, পিতা-জনাব সৈয়দ আলী, গ্রাম-আবুডাঙ্গা।

৩। জনাব মোঃ চাঁদ মিঞা, পিতা-জনাব তমিজউদ্দিন মুন্সি, গ্রাম-কাপসাইল।

৪। জনাব মোঃ অছিমুদ্দিন, গ্রাম-শালিকার টেক।

৫। বাবু গুপ্ত প্রসাদ দাস, গ্রাম-পাঁচথুবী।

৬। বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম-সিংজুরী।

৭। বাবু ফণী ভূষণ সরকার, গ্রাম-বাঙ্গালা।

মুসলমানদের ভিতর আমি এবং জনাব অছিমুদ্দিন ছাড়া আর কেহই জীবিত নাই। ধীরেন্দ্র ঘোষও মারা গিয়াছে জানি। গুপ্ত প্রসাদ ও ফনী ভূষণ ভারতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা জীবিত আছে কিনা জানি না।

এখানে একটি কথা বলা দরকার যে তেরশ্রী হাইস্কুলের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া যাওয়ায় ১৯৩২ ইং সন হইতে ৯ম এবং ১০ম শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হয়। ঐ বৎসর যে সকল ছাত্রেরা ৮ম শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণীতে এবং ৯ম শ্রেণী হইতে ১০ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিল তাহাদিগকে অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছিল। এরপর বেশ কয়েক বৎসর ঐ স্কুলে কেবল ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হইত। ঐ সময়ে হেডমাষ্টার ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানার বরিকান্দি গ্রামের জনাব মোঃ আবদুল আজিজ সাহেব। তাঁহার মত একজন আদর্শ শিক্ষক এবং এত ধার্ম্মিক লোক অতি বিরল।

পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে এখন আমরা স্কুলে কিভাবে যাতায়াত করিতাম তাহা সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিতেছি।

তেরশ্রী আমাদের বাড়ী হইতে অনুমান ৩ মাইল হইবে। শুক্না মৌসুমে পায়ে হাটিয়াই স্কুলে যাতায়াত করিতাম। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করিতাম। তেরশ্রী পাঠশালায় এবং তেরশ্রী হাইস্কুলে পড়ার সময় প্রথম বৎসর তিনেক যোগেশদের নৌকায় করিয়াই স্কুলে যাতায়াত করিতাম। যোগেশদের বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে পূর্ব দিকে অনুমান

৬০০/৭০০ গজ দূরে হইবে। চাড়ি (গরুর খাওয়ানোর পাত্র) বাহিয়া যোগেশদের বাড়ী যাইতাম এবং চাড়িটা ঐ বাড়ীতে রাখিয়া সে এবং আমি ওদেরই নৌকা করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতাম। আমার বেশ মনে আছে সে আমার পিতা ঘিওরহাট হইতে বার আনা দিয়া একটা খুব বড় রকমের চাড়ি ক্রয় করিয়া আমাকে ঐ চাড়ি বাহিয়া যোগেশদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে বলিলে আমি কাঁদিয়াছিলাম। এর পর সম্ভবত ষষ্ট শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার পিতা পাঁচথুবী গ্রাম নিবাসী জনাব তমিজ উদ্দিন মুন্সীর (তিনি তখন সিংজুরী পাঠশালায় মাষ্টারী করিতেন) একখানা পুরাতন ও ভাঙ্গা শালকাঠের কোশা নৌকা পাঁচটাকা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ কোশা নৌকাটী মেরামত করিয়া আমি এবং যোগেশ নিজেরা বৈঠা বাইয়া স্কুলে যাতায়াত করিতাম। ঐ সময়ে উলাইল, গাজিছাইল প্রভৃতি গ্রাম হইতে অনেক ছেলেরা তেরশ্রী স্কুলে পড়িত। নৌকায় যাওয়া আসার সময় পাল্লা দিয়া পাল্লায় তাহাদের সহিত পারিতাম না। কারণ আমাদের কোশা নৌকা বিধায় দ্রুত চলিত না এর জন্য যোগেশ রাগান্বিত হইয়া নৌকায় লাথি মারিয়া রাগ মিটাইত এবং ভাল নৌকা না কেনার জন্য আমাকে বকিত। অনেকদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফেরার পথে ইচ্ছাকৃত ভাবে নৌকা ডুবাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল খুব সীমিত। দুই একখানা ধুতি, একখানা লুঙ্গি ও একটা গেঞ্জী। হিন্দু ছাত্রেরা সবাই ধুতি পরিয়া স্কুলে যাইত। মুসলমান ছাত্ররা ধুতি এবং সময় সময় লুঙ্গি পরিয়াও স্কুলে যাইত। মুসলমান শিক্ষকরাও প্রায়ই লুঙ্গি পরিতেন। তখনকার দিনে বেহালা মার্কা ও আম মার্কা নামক খুব ভাল মানের মারকীন থান কাপড় পাওয়া যাইত। মূল্য ছিল প্রতিগজ চৌদ্দ পয়সা বা চার আনা। ঐ কাপড় ২ গজ ছয় গিরা আট আনা বা নয়আনা দিয়া ক্রয় করিয়া লুঙ্গি তৈয়ার করা হইত। ঐ প্রকার লুঙ্গি প্রায় সকলেই ব্যবহার করিত। এতদূর স্কুলে যাওয়া আসার দরুণ বাড়ীতে পড়ার সময় খুবই কম পাওয়া যাইত। একমাত্র রাত্রিকালেই পড়াশুনা করিতাম। আমি আমাদের কাচারী ঘরে বসিয়া পড়িতাম কিন্তু প্রায় দিনই লোক আসিয়া পড়ার ব্যাঘাত ঘটাইত। পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ বাড়ীতে ছিল না বলিলেও চলে।

স্কুলে পরিদর্শক বা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে মুসলমান ছাত্রদিগকে টুপী মাথায় দিয়া স্কুলে যাইতে হইত এবং আমরা ছাত্রেরা কলা গাছ পুঁতিয়া গেট তৈয়ার করিতাম নানা বর্ণের কাগজ দিয়া এবং দেবদারু গাছের পাতা দিয়া স্কুল ঘরের বারান্দার সব খুঁটি মোড়াইয়া সাজাইতাম।

তৎকালে গ্রীষ্মে মাসাধিক কাল এবং দূর্গাপুজা উপলক্ষে মাসাধিক কাল স্কুল বন্ধ দেওয়া হইত। যেদিন বন্ধ হইত সেদিন স্কুলে পড়ান হইত না। শিক্ষকগণ ক্লাশে আসিলে প্রত্যেক ছাত্রই একে একে তাঁহাদেরকে ছালাম করিত এবং কেহ গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিত তখন সকলেই হাতে তালি দিতাম। শিক্ষক ছাত্র সবারই জন্য ঐ দিনটা একটা মহা আনন্দের দিন ছিল। পূজার বন্ধের সময় প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই স্কুলের দপ্তরীকে দুই আনা চারি আনা করিয়া পয়সা দিতাম; ইহাকে পুরবী বলা হইত। আমাদের সময়ে তেরশ্রী স্কুলের দপ্তরী ছিলেন ঐ গ্রামেরই মনোমোহন সরকার। তিনি খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

আমি যে সময়ে ম্যাট্রিক পাশ করি তখনকার সময়ে পাড়াগায়ের সাধারণ লোকদের জন্য কলেজে পড়ার ইচ্ছা করাটা ছিল একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। তখন কেবলমাত্র ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা শহরে কলেজ ছিল। জেলা শহর ছাড়া মাত্র একটি আই, এ কলেজ ছিল করটীয়াতে। শহরের কলেজে পড়াশুনা করার খরচ বহন করার মত আর্থিক অবস্থা প্রায় কাহারই ছিল না বলা চলে। আমার পক্ষে যে তাহা মোটেই সম্ভব ছিল না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বি,এ, পাশ করার প্রবল ইচ্ছা ছিল আমার। তাই করটীয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে মনস্থ করিলাম। কিছু টাকারতো প্রয়োজন। টাকা নাই। পড়া খরচ চালানোর জন্য আমার পিতা জমি বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে বহরাগ্রাম নিবাসী দলিমুদ্দিন মাতবর সাহেব এক বিঘা জমি ৮০ টাকা মূল্যে খরিদ করিতে রাজী হন। কিন্তু পরে তিনি জমি খরিদ করিবেন না বলিয়া জানান। বহু চেষ্টা করিয়াও আর কোন ক্রেতা পাওয়া গেল না। কাজেই বাধ্য হইয়া ঐ বৎসর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল। এক বৎসর চলিয়া গেল কিন্তু কোন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইল না। চিরতরে লেখা পড়া বন্ধ হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া আমি একেবারে উতলা হইয়া পরিলাম।

তারপর ১৯৩৩ ইং সনে ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা না করিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া করটীয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। করটীয়া হাইস্কুলের দক্ষিণ দিকে দীঘির পারে যে দালানটা আজও বিদ্যমান ঐটাই তখনকার কলেজ ছিল। কলেজের বেতন ছিল মাসে ৪ টাকা করিয়া। তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক জনাব ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। করটীয়ার অনতিদূর বীর পুশিয়া গ্রামের জনাব হজরত আলী মিঞার বাড়ীতে জায়গীর ঠিক হইল। হজরত আলী মিঞা একজন গরীব লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনটা ছিল খুবই উদার। তিনি সব সময়েই একজন করিয়া কলেজের ছাত্র জায়গীর রাখিতেন। তাঁহার ছেলে দানেশ স্কুলে পড়িত। তাহাকে আমি বাড়ীতে পড়াইতাম। পরবর্ত্তী কালে আমি যখন ঘাটাইল থানায় O/C তখন উক্ত জনাব হজরত আলী মিঞা ঐ থানায় গিয়াছিলেন। অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম এবং তাহার জন্য কিছু জামা কাপড় ক্রয় করিয়া দিয়াছিলাম।

তাহার পর ইংরেজী ১৯৫৯ সনে টাঙ্গাইল থানায় O/C থাকাকালীন একদিন বীরপুশিয়া গ্রামে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তখন উক্ত হজরত আলী মিঞা এবং তাঁহার ছেলে দানেশ জীবিত ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী আমাকে দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়েন নাই। আমি তাঁহার জন্য কাপড় ক্রয় করিয়া নিয়া গিয়াছিলাম।

কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার কিছুদিন পর একটা পরীক্ষা হইল। ঐ পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় ছাত্রকে হাফ ফ্রি দেওয়া হইত। পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি হাফ ফ্রি লাভ করিলাম। কিন্তু প্রতিমাসে দুইটাকা করিয়া বেতন দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। পরবর্ত্তী বৎসর (১৯৩৪) প্রথম বর্ষের বাৎসরিক পরীক্ষা দেওয়ার সময়

পরীক্ষার ফিস্ সহ বকেয়া বেতন দিতে না পারায় আমি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পরে ঐ বৎসর জুলাই মাসে বাধ্য হইয়া চিরতরে লেখাপড়া ত্যাগ করিতে হইল। আমার বি, এ, পাশের স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। মাসে মাত্র দুই টাকা করিয়া বেতন দিতে না পারায় পড়া চালাইতে পারি নাই, একথা আজকাল কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ইহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না।

আমার পিতার ১৪/১৫ বিঘার মত জমি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত যত্নের অভাবে তাহাতে সন্তোষজনকভাবে শস্য উৎপন্ন হইত না। আমার পিতা কোন দিনই কৃষি কাজ করেন নাই; করিতে পারিতেনও না। পূর্ব্বে তাঁহার একটা কাপড়ের দোকান ছিল; তাহাও বাকী পড়ার কারণে অচল হইয়া যায় এবং বেশ কিছু টাকা লোকসানও হইয়াছিল।

তখনকার দিনে সাবরেজিষ্ট্রারের চাকুরী, দারোগার চাকুরী, সরকারী অফিস আদালতে কেরানী ইত্যাদির চাকুরীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ম্যাট্রিক পাশ সরকারীভাবে নির্দ্ধারিত ছিল। বয়স সীমা নির্দ্ধারিত ছিল ২০ হইতে ২৪ বৎসর। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বড় বড় শহরই ছিল তখনকার দিনে প্রায় সব চাকুরীর কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু আমার পক্ষে অর্থনৈতিক কারণে শহরে যাইয়া চাকুরীর খোঁজ করা সম্ভব ছিল না। আমার বেশ মনে আছে, ঐ সময়ে সুরেন্দ্র বাবু নামক বি, এ, পাশ এক ব্যক্তি মাত্র ১০্ দশ টাকা বেতনে তেরশ্রী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। এতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে তখনকার দিনে চাকুরী পাওয়া কত কঠিন ব্যাপার ছিল। যাহা হোক লেখাপড়া ছাড়িয়া আমি ভবঘুরের মত দিন কাটাইতে লাগিলাম।

২৫/১/৩৫ ইং তারিখে মানিকগঞ্জ আসিয়া তদানিন্তন অত্যন্ত খ্যাতিমান উকীল জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি আমাকে পুলিশ বিভাগে কন্‌ষ্টবল পদে ভর্তি হইতে উপদেশ দিলেন। ভাল কাজ দেখাইতে পারিলে এ চাকুরীর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল বলিয়া তিনি আমাকে বলিলেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ধামরাই থানার গরজানা গ্রামের খান বাহাদুর খোরশেদ সাহেবের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি মাত্র চতুর্থী শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করিয়া কন্‌ষ্টবল পদে ভর্তি হইয়াছিলেন। তখন কন্‌ষ্টবলদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র সাড়ে চার টাকা। পরবর্তীতে কার্য্যদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ডি,আই,পিজ, সি,আই,ডি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এর পূর্বে কোন বাঙ্গালী ঐ পদ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় উকীল সাহেব আমাকে বলিলেন। তিনি তখন স্বতঃস্ফুর্ত হইয়াই ফরিদপুর জেলার তদানিন্তন পুলিশ সুপার মিঃ শামসুদ্দোহা সাহেবের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। এর পূর্বেও বহরাগ্রাম নিবাসী জনাব শহর আলী সাহেব আাকে কন্‌ষ্টবল পদে ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি তখন দফাদারী চাকুরী করিতেন।

উকীল সাহেব প্রদত্ত চিঠিখানা অপর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হইল।

Manikganj
25/1/35

My Dear Doha,

I am Sending the bearer of this letter Md. Hayat Ali to you. He is a candidate for the post of a Constable. He comes of a respectable Mohammedan family of the Manikganj Subdivision. I am greatly interested in him. He has passed the Matriculation Examination & read up to the 1st year I.A. Class. His moral Character is good. I shall deem it a personal favour if you kindly provide him with the post of a police Constable. My best Compliments to your Begum shahiba & yourself & my effection & blessings to your kids. I am so so. Hoping you are alright.

Yours Sincerely
Aboul Latif Biswas

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে আমার পিতা পুলিশে চাকুরী করার বিরোধী ছিলেন। তাই আমার পিতাকে না জানাইয়া জনাব লতিফ সাহেবের উক্ত চিঠি লইয়া মানিকগঞ্জ হইতেই ফরিদপুর যাত্রা করি। এখান হইতে প্রথম খালিশা কোঠাদারা গ্রামে আমার ছোট মামা জনাব তালেবর খাঁর বাড়ীতে যাই। ইং ৩১/১/৩৫ তারিখে খুব ভোরে তিনি আমাকে ষ্টিমার ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলে ষ্টীমার যোগে আমি টেপাখোলা ষ্টেশনে নামিয়া ওখান হইতে হাটিয়া ফরিদপুর শহরে পৌছি। বারেক মিঞার হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঐ হোটেলেই রাত্রি যাপন করি। ঐ সময়ে ঐ হোটেলই ছিল শহরের সব চেয়ে বড় এবং ভাল হোটেল।

পরদিন অর্থাৎ ইং ১/২/৩৪ তারিখ ভোরে পুলিশ লাইনে আসিয়া দেখিতে পাই যে অনুমান ৩০/৪০ জন অল্প বয়সী যুবক সারিবদ্ধভাবে রিজার্ভ অফিসের সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই কনষ্টেবল পদপ্রার্থী। আমিও ঐ লাইনে সামিল হইলাম। কিছুক্ষণ পর পুলিশ সুপার মিঃ দোহা সাহেব আসিয়া কাহার কি শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ও অপর দুইজনকে রিজার্ভ অফিসের ভিতরে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। প্রথম যাহার মাপ নেওয়া হইল তিনি এক চোখ বন্ধ করিয়া অপর চোখ দিয়া তাকাইতে অসমর্ধ হওয়ায় তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে বলা হইল। এর পর আমার মাপ নেওয়া হইল এবং আমার উচ্চতা প্রয়োজনীয় উচ্চতা হইতে কম বলিয়া মাপ গ্রহণকারী ইনস্পেক্টর মিঃ পি, কে, সান্ত্রা বলিলে তখন পুলিশ সুপার সাহেব আমাকেও বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। তখন আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে আমি অনেকবার নিজেকে মাপিয়া দেখিয়াছি; আমার উচ্চতা কিছুতেই কম হইতে পারে না। তখন পুলিশ সুপার সাহেব অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া নিজেই আমার উচ্চতার মাপ নিলেন এবং আমার উচ্চতা ৫´৪´´ ½ (পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি) হইল। প্রয়োজনীয় উচ্চতা ছিল ৫´৪´´। তখন সুপার সাহেব বলিলেন "Well Mr. Santra, his measurment is quite allright"। ইনস্পেক্টর সান্ত্রা সাহেব ভীষণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "I am sorry Sir" তখন তখনই আমার নামধাম সুপার সাহেব নিজেই নির্দ্দিষ্ট রেজিষ্ট্রারে লিখিলেন। অপর ব্যক্তি, নাম আমজাদ আলী বাড়ী মকশুদপুর থানার নওহাটা গ্রামে, তাহারও মাপ নেওয়ার পর, উক্ত রেজিষ্ট্রারে লেখা হইল। ঐ দিনই সিভিল সার্জন দ্বারা পরীক্ষা করানোর পর আমাদের দুইজনকেই ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আমার চাকুরী আরম্ভ হইল। বেতন প্রতিমাসে ২০/ টাকা মাত্র।

বলা বাহুল্য যে জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস সাহেবের চিঠি খানা পুলিশ সুপার সাহেবকে দেওয়ার আর কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহার নেওয়া ভূমিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কারণ তিনি আমাকে উৎসাহিত করিয়া এবং চিঠি লিখিয়া না দিলে আমি হয়তো ফরিদপুর যাইতাম না এবং আমার চাকুরীও হয়তো হইতো না।

এই কারণে আমি জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ এবং আজও তাঁহার নাম গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি এবং তাঁহার বিদেহী আত্মার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বশক্তিমান ও পরমদয়ালু আল্লাহ পাকের দরবারে মোনাজাত করি। শ্রদ্ধেয় উকীল সাহেবের লিখা উক্ত চিঠি খানা আজও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত।

চাকুরী হওয়ার ৩/৪ দিন পর ছুটি নিয়া বাড়ী আসিয়া আমার পিতাকে সব কথা বলি এবং বিছানাপত্র লইয়া যাই। ঐ বৎসর জুন মাস পর্যন্ত পুলিশ লাইনেই থাকিতে হয়। পুলিশ লাইনের নিকটবর্ত্তী কুটীমিঞা নামক এক ব্যক্তির হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিতাম। তাহার পর জুন মাসের প্রথম দিকে অন্যান্যদের সহিত প্রশিক্ষণের এর জন্য সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজে যাই। ম্যাট্রিক পাশ বলিয়া Advanced ক্লাশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া ইংরেজী ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ফরিদপুর ফিরিয়া আসি। কয়েক দিন পর লিটারেট কনষ্টেবল হিসাবে আমাকে বদলি করা হয় মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত গোসাইর হাট থানায়। সেখানে কেবলমাত্র সেরেস্তায় লেখালেখির কাজ করিতে হইত। মফস্বলে যাইতে হইত না। রান্না করার জন্য একজন ছেলেকে রাখিয়াছিলাম। প্রতিমাসে দুইজনের খাওয়া বাবদ খরচ হইত ৮/৯ টাকা। তখন ‘চা’ খাওয়ার বেশী প্রচলন ছিল না। মাঝারী রকমের একটা তাজা ইলিশ মাছ চার পয়সায় পাওয়া যাইত।

গোসাইর হাট থানার পর ১৯৩৭ সনে আমাকে ফরিদপুর রিজার্ভ অফিসে বদলি করা হয়। ঐ অফিসে চাকুরী করা কালীন ১৯৩৮ সনে আমি এ, এস, আই পদে প্রমোশন পাইয়া ঐ অফিসেই কাজ করিতে থাকি। তখন এ, এস, আইর মাসিক বেতন ছিল ৩০/ টাকা হইতে ৪০/ টাকা। ১৯৩৯ সনের শেষের দিকে আমাকে বদলী করা হয় গোপালগঞ্জ থানায়। ঐ থানায় চাকুরী করা কালীন ১৯৪০ ইং সনে আমার বিবাহ হয় ১০/৩/৪০ তারিখে। পরবর্ত্তী চাকুরীর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করার পূর্বে এখন আমার বিবাহের কথা কিছু উল্লেখ করিতেছি।

বিবাহ

ঘিওর থানার অন্তর্গত সিধুনগর (পয়লা) নামক গ্রামের জনাব ছবেদ আলী মিঞার ছেলে জনাব হোসেন আলী মিঞার বড় মেয়ে নুরজাহান বেগম (ডাক নাম আফা) এর সহিত আমার বিবাহ হয় ইংরেজী ১০/৩/৪০ তারিখে। তেরশ্রী জমিদার বাড়ীর একজন তহশীলদার ছিলেন বলিয়া তিনি হোসেন আলী গোমস্তা নামে পরিচিত ছিলেন। বিবাহের সময় নূরজাহানের বয়স ছিল অনুমান মাত্র ১১ বৎসর। তাহার ভাই আজহারুল ইসলাম (নওয়াব) এবং আঃ রেজ্জাক (তুলু) এর বয়স ছিল যথাক্রমে অনুমান ৮ এবং ৬ বৎসর।

বিবাহের পূর্ব্বে আমি পাত্রী দেখি নাই। আমার পিতা দেখিয়াছিলেন, তাই আমি নিজে দেখার কোন প্রয়োজন বোধ করি নাই। ছেলে মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে তখনকার দিনে মুরুব্বীরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন এবং ছেলে মেয়েরা বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইত। ব্যতিক্রম সমাজে তখন খুবই নিন্দনীয় এবং ঘৃণিত ছিল। "এখন জমানা বদলাইয়া গিয়াছে"।

আমি গোপালগঞ্জ থানা হইতে ছুটি লইয়া বাড়ী আসি ঠিক বিবাহের দিন অর্থাৎ ১০/৩/৪০ তারিখ সকাল ১০/১১ টার সময়। বাড়ী আসিয়া জানা গেল যে উভয় পক্ষই বিবাহের প্রস্তুতি শেষ করিয়াছেন। বিবাহ উপলক্ষে উভয় পক্ষই আতস বাজী, গাইটা, লাঠিয়াল সরদার প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। ঐ সব ব্যবস্থাপনায় আমাদের পক্ষে মূখ্য ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন আমাদের বাড়ীর লাগ পূর্ব্ব দিকের বাড়ীর জনাব জান মামুদ শেখ (হজরত আলীর পিতা)। তাহাকে জান মামুদ ভাই বলিয়া আমরা ডাকিতাম। আমার মেঝো খালা, বড় খালার ছেলের স্ত্রী, মামাতো বোন প্রভৃতি আরও অনেক নায়রী আনা হইয়াছিল। কন্যা পক্ষও তাহাদের প্রত্যেক আত্মীয় স্বজনকে এই বিবাহে আনিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর অনুমান ৯/১০ টার সময় সমস্ত বরযাত্রী (অনুমান ৪০/৫০ জন) সহ চার বেহারার পালকিতে চড়িয়া যাত্রা করি। যাত্রার প্রাক্কালে স্নেহময়ী প্রয়াত মায়ের কথা মনে হওয়ায় ঝরঝর করিয়া দুই চোখের পানি পড়িতে থাকে, চেষ্টা করিয়াও উহা রোধ করিতে পারি নাই। ভাড়া করা ৬/৭ জন লাঠিয়াল সরদারও বরযাত্রীর সামিল ছিল। বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া সারা রাস্তায় তাহারা উচ্চস্বরে নানা রকম ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যাইতেছিল। অন্যদিকে পালকি বহনকারী পশ্চিমা বেহারাও হাটার তালে তালে তাহাদের ভাষায় বেশ জোরে জোরে কি যেন বলিতেছিল। উহা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য ছিল। রাস্তার পাশ্ববর্ত্তী সব বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বুড়া, জোয়ান, নির্ব্বিশেষে রাস্তায় আসিয়া উহা অবলোকন করিতেছিল। এ এক অপরূপ দৃশ্য। যেন কোন রাজা তাহার সৈন্য সমস্ত লইয়া দিগ্বিজয়ে যাইতেছে। যাহা হোক পরে যখন বরযাত্রীরা কনে পক্ষের বাড়ীর ২০০/৩০০ গজের মধ্যে আসিয়া পৌছিল তখন কনে পক্ষের লাঠিয়াল সরদারেরা ডাকের মাধ্যমে বরযাত্রীদের অগ্রগতি রুখিয়া দিল। এর পর এক পক্ষের সরদারেরা প্রশ্ন সম্বলিত ডাক ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং অপর পক্ষ ডাকের মাধ্যমে উত্তর দিয়া প্রশ্ন সম্বলিত পাল্‌টা ডাক ভাঙ্গিতে লাগিলেন। এই প্রকার ডাক ভাঙ্গাভাঙ্গি চলিল বেশ কিছুক্ষণ; কেউ হারে না কেউ জিতে না সমানে সমান। অবশ্য সরদাররা ছাড়া আর সবাইকে আগেই বাংলায় নিয়া বসান হইয়াছিল। এরপর এক পর্যায়ে আমাদের সরদারেরা অপর পক্ষের সরদারদের প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হইল। এখন জিজ্ঞাসা করি (অবশ্য চুপে চুপে) স্বাগতিক কন্যা পক্ষের নিকট কি এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হইল?

প্রথানুযায়ী বরপক্ষের সবাইকে সর্ব্বপ্রথম সরবৎ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। কিছুক্ষণ পর বহুপ্রতীক্ষিত এবং আজন্ম লালিত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সুখ স্বপ্নের বাস্তবে রূপ নেওয়ার শুভ

মূহূর্ত্তের শুভ আগমন হইল। কাজী সাহেব বিবাহ মজলিশেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাবীন রেজিষ্ট্রারী করিলেন। মোহরানা ধার্য্য হইল ১৫০০/ দেড় হাজার টাকা। তখনকার দিনে এত উচ্চাংকের মোহরানা ধার্য্যের নজির ছিল অতি বিরল। সোনার মূল্য তখন ছিল প্রতি ভরি ২০ টাকা। এখন ১৯৯৬ সাল, সোনার মূল্য প্রতি ভরি ৬০০০/ ছয় হাজার টাকা। এই হিসাবে তখনকার ১৫০০/ দেড় হাজার টাকা এখনকার দিনের ৪৫০০০০/ চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার সমান দাঁড়ায়।

কাবীন রেজিষ্ট্রারীর পর বিবাহ পড়ানোর জন্য আমার কথামত আমার শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শিক্ষক তেরশ্রী স্কুলের হেড মৌলবী জনাব নছিমুজ্জমান সাহেবকে অনুরোধ করা হইলে, তখনকার ঐ গ্রামের মোল্লা জনাব মনিরুদ্দিন মুন্সী (মনু মুন্সী) সাহেবের তরফ হইতে আপত্তি উঠিল। কারণ তখনকার নিয়মানুযায়ী গ্রামের মোল্লা সাহেবই বিবাহ পড়াইতেন এবং মোল্লাকীয় টাকা তাহারই প্রাপ্য ছিল। জানা গেল যে, বিবাহ পড়ানোর বাবদ মোল্লা সাহেবেরা ২/দুই টাকা হইতে ৪/চারি টাকা পর্যন্ত পাইয়া থাকেন। জনাব মনিরউদ্দিন মুন্সী সাহেবকে তখন ৪/চারি টাকা দেওয়া হইল। কিন্তু বিবাহ উক্ত জনাব মৌলভী নছিমুজ্জমান সাহেবই পড়াইলেন রাত্রি ১২ টার কিছু পূর্ব্বে। মৌলবী সাহেবকে বিবাহ পড়ানো বাবদ ১০/দশ টাকা দেওয়া হইল। মজলিশে উপস্থিত সকলেই অবাক, তাহারা পূর্ব্বে বিবাহ পড়াইয়া কোন মোল্লা মৌলবিকে ১০/দশ টাকা পাইতে দেখেন নাই। তখনকার দিনে ১০/দশ টাকায় উচ্চমানের ৪ চার মন চাউল পাওয়া যাইত।

বিবাহ মজলিশে আমার প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ সাহেব যাহার বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর থানাধীন বরিকান্দি গ্রামে এবং জনাব মৌলবী নছিমুজ্জমান সাহেব, তাঁহার বাড়ী ছিল ঐ জেলারই মির্জাপুর থানাধীন হালালিয়া গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মানিকগঞ্জের বর্ত্তমান পীর জনাব আযহারুল ইসলাম সাহেবের পিতা ছিলেন উক্ত মৌঃ নছিমুজ্জমান সাহেব। তখনকার দিনের ঐ অঞ্চলের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মাইলাগী গ্রামের জনাব ইয়াকুব আলী মোল্লা সহ বহু গণ্যমান্য লোক বিবাহ মজলিশে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ পড়ানোর পর খানা। পোলাও, খাশির গোস্ত এবং পরে খাসা দই। অনুমান ২০/২৫ প্রকার বিভিন্ন রকমের খাদ্য সামগ্রী বিশেষ ধরনের একটী বড় পাত্রে সাজাইয়া বরের সম্মুখে হাজির করা হয়। ইহাকে সাককরখানা বলা হইত।

খাওয়া দাওয়ার পর পুথী পাঠের পালা। তালুকনগর গ্রামের জনাব খবির উদ্দিন মুন্সী সাহেব একজন বরযাত্রী ছিলেন। তিনি খুব ভাল পুঁথি পাঠ করিতে পারিতেন। ভোর পর্য্যন্ত তিনি নানা রকম সুরে এবং নানা রকম ভঙ্গিতে পুঁথি পাঠ করিলেন।

ফজরের নামাজের পরও কিছুক্ষণ পুঁথি পাঠ হইল। তাহার পর নাস্তা। পায়েস, চাউলের অতি মিহী সেমাই, খৈ পাক দেওয়া, চিড়ার মোয়া ইত্যাদি পরিবেশন করা হইল।

এরপর উঠানে দুইপক্ষের সরদারদের লাঠি খেলা এবং আরও বিভিন্ন রকমের খেলা হইল। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহুলোক উহা উপভোগ করে। খেলা শেষে দুপুরের খানা।

বলা বাহুল্য ঐ সময়ে দৈ, খানার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। অতি উন্নতমানের দৈ যাহাকে খাশা দৈ, বলা হইত তাহারই ব্যবস্থা ছিল। দৈ পরিবেশনের সময় খাদিমদারেরা মেহ্মানদের উপর বেশ জুলুম করিত অর্থাৎ নিষেধ সত্ত্বেও পাত্রে জোর করিয়া দৈ দিত। এতে বহু দৈয়ের অপচয় হইত।

বরযাত্রীদের খাওয়ার পর বাড়ীর লোকদের খাওয়া দাওয়া শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। তখন বরকে কোলদারাসহ অন্দরে নিয়া যাওয়া হয়। কোলদারাদের কাজ ছিল সর্ব্বক্ষণ বরের সঙ্গে থাকিয়া তাহার পক্ষ হইতে কথাবার্তা বলা এবং তাহার সকল কাজে কর্ম্মে সাহায্য প্রদান করা। বরের বোনের জামাইরাই সাধারণত কোলদারার ভূমিকা পালন করিত। আমার কোলদাররা ছিল বোনের জামাই রিয়াজ উদ্দিন (মোতালেবের পিতা)। আন্দরে অনেক মেয়েলী আচার অনুষ্ঠানের পর্ব্ব শেষে বরের ছালামের পালা আসে। মুরব্বী স্থানীয় প্রায় ৯/১০ জন মহিলা বারান্দায় কাতারবন্দী হইয়া দাড়ান।

পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর বরকে তাহাদের প্রত্যেককে একে একে ছালাম করিতে হয়। তখনকার প্রথানুযায়ী ছালামের সময় সম্মান স্বরূপ তাহাদের প্রত্যেককেই ৫/১০ টাকা করিয়া দিতে হইত এবং তাহারা প্রাপ্ত টাকার দ্বিগুণ টাকা তখনই বরের হাতে দিয়া দোয়া করিতেন।

এখন বিদায়ের পালা। বিদায় চিরন্তন, বিদায় আবশ্যিক, বিদায় অনিবার্য্য এবং কাম্য। এতদিন কত স্নেহ-যত্ন দিয়া মা বাবা তাঁহাদের স্নেহের দুলালীকে লালন পালন করিয়া পরে তার জন্য সৎপাত্র যোগাড় করিতে যাইয়া কতইনা কাঠখর পোড়াইতে হইয়াছে। ঐ সবের পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য এবং যে আশা আকাঙ্খা ছিল তাহারইতো পরিসমাপ্তি এখনকার এই বিদায়লগ্ন। এটাতো তাঁহাদের একান্তকাম্য। তবে মনভারাক্রান্ত কেন? কেন এই চোখের পানি? এর একটাইমাত্র জবাব-অপত্য স্নেহ। যাহা হৌক বরের হাতে কন্যা সম্প্রদানের পর নববিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া একই পাল্কিতে চড়িয়া বাড়ী ফিরিলাম। রাস্তায় আতসবাজী ফুটিল এবং লাঠিয়ালরা তাহাদের ভূমিকা যথাযথ পালন করিল।

পরের দিন আমাদের বাড়ীর উঠানেও লাঠিয়ালরা লাঠি খেলা এবং অন্যান্য খেলা দেখাইল এবং ইহা প্রত্যক্ষ করার জন্য বহু লোকের আগমন হইয়াছিল। এই হইল আমার বিবাহের মোটামুটি কাহিনী। এহিক্ষন আমার বিবাহের ৫৬ তম বৎসর কাটাইতেছি। খোদার মর্জ্জি আমাদের এই নাতিদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন অতি সুখেরই বলিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে বিবাহে কোন পক্ষেরই কোন দাবী-দাওয়া ছিল না; তবে কনে পক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবেই গহনাপত্র এবং কাপড় চোপড় দিয়া কনে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। আমার সম্পূর্ণ অমতে আমাকে ৪৫/- পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়া একটী West & Watch কোম্পানীর কিপসেক ঘড়ি দেওয়া হইয়াছিল।

এই অধ্যায়ের ইতি টানার পূর্ব্বে আমার শ্যালক শালিকা প্রভৃতির কথা অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আমার বিবাহের সময় শ্যালক নওয়াব (আজ্হারুল ইসলাম) ও তুলু (মোঃ রাজ্জাক) এর বয়স ছিল অনুমান যথাক্রমে ৮ এবং ৬

বৎসর। শ্যালক নুরু (নুরুল ইসলাম) ও বাচ্চু (রুহুল আমিন), শ্যালিকা সুফিয়া এবং রানু আমাদের বিবাহের পরে জন্মগ্রহণ করে। আজহারুল ইসলাম জুট ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করিত। তাহার পিতামাতার বর্ত্তমানেই সে নাগরপুর থানাধীন জালালিয়া গ্রামের শ্বশুর বাড়ীর নিকটে বাড়ী করিয়া বসবাস করিতে থাকে। এখন সে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ গ্রামেই বসবাস করিতেছে। আবদুর রেজ্জাক সাবরেজিষ্ট্রারী অফিসে এবং রুহুল আমিন ও তার স্ত্রী বর্ত্তমানে মানিকগঞ্জ পি,টি,আই স্কুলে চাকুরীরত।

শ্যালিকা সুফিয়ার বিবাহ হইয়াছে নাগরপুর থানাধীন আন্দিবাড়ী গ্রামের হাসেলউদ্দিন মিঞার সহিত। তিনি এখন ঢাকা ওয়াপদায় চাকুরীরত। ছোট শ্যালিকা রানুর বিবাহ হইয়াছে আমার চাচাতো ভাই তৈয়বউদ্দিনের সহিত। তৈয়ব উদ্দিন টাংগাইল কাগমারী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছে।

এখন আমার নানা শ্বশুরের কথা কিছু না বলিলে তাঁহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া কথা হইতে পারে। তাই অতি সংক্ষেপে তাঁর কথাও কিছু লিখিতেছি। আমার স্ত্রীর নানার নাম ছিল জনাব ছমর উদ্দিন মিঞা। বাড়ী দৌলতপুর থানাধীন সমেতপুর গ্রামে। তাঁহার দুই ছেলে, জনাব তছলিম উদ্দিন ও জনাব আফিল উদ্দিন। বড় ছেলে এখন মৃত। তাঁহার এক মেয়ে জয়গননেছার বিবাহ হইয়াছিল মানিকগঞ্জ থানার বারইলগ্রামে। জয়গনের স্বামী মৃত। তাঁহার এক মেয়ে মানিকগঞ্জ জজ কোর্টে চাকুরী করিতেছে। জনাব আফিল উদ্দিন সাহেব প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করিতেন এখন অবসরপ্রাপ্ত। তাঁহার এক ছেলে মিলু (ডাক নাম) এবং তাহার স্ত্রী উভয়েই এখন ফরিদপুর পি,টি,আই স্কুলে চাকুরী করিতেছে। আফিল উদ্দিন সাহেবের অন্য ছেলেরাও বেশ শিক্ষিত।

আমার নানা শ্বশুরের মেয়ে ছিল ৪জন। আমার শ্বাশুরী ছিলেন মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মধ্যম জনের বিবাহ হইয়াছিল মৈদিনগরের জনাব কছর উদ্দিন শেখের ছেলে জনাব সদর উদ্দিন সাহেবের সহিত। মৈদিনগর গ্রাম নদীগর্ভে চলিয়া যাওয়ার পর সদর উদ্দিন সাহেব বাড়ী করেন জাফরগঞ্জের নিকট রাহাতপুর গ্রামে। তাহার ছেলে মান্নাফ এবং টুকু এখন মৃত। ছোট ছেলে কাওছার এখন ঐ বাড়ীতে বসবাস করিতেছে। তৃতীয় মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল ধুবরিয়া গ্রামে। তাঁহার ছেলে মোঃ জব্বার এখন সিধুনগর গ্রামে বাড়ী করিয়া বসবাস করিতেছে। বড় ছেলে আঃ ছামাদ এখন প্রয়াত।

নানা শ্বশুরের ছোট-মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল টাংগাইল থানাধীন গয়হাটা গ্রামের জনাব রহিমউদ্দিন খাঁর সহিত। তিনি জীবিত নাই। তাঁহার দুই ছেলেঃ ১। কহিনূর খান ও ২। আমিনূর খান এবং ৭ মেয়ে। বড় মেয়ে রাবেয়ার বড় মেয়ে শামিম আরা (রোজী)-র সহিত আমার বড় ছেলে আবু (হারুণ-আল-রশিদ)-এর বিবাহ হইয়াছে। আমার নানা শ্বশুরের ছোট ছেলে এবং ছোট মেয়ে ছাড়া আর কোন ছেলে মেয়ে জীবিত নাই।

চাকুরী জীবনের কিছু কথা

এখন আমি পরবর্ত্তী চাকুরী জীবনের কথায় ফিরিয়া যাইতেছি।

গোপালগঞ্জ থানায় চাকুরী করার পর আমি এ,এস,আই হিসাবে রাজবাড়ী থানায়, পালং সার্কেলের ইন্‌স্পেকটর অফিসে রিডার হিসাবে, ফরিদপুর রিজার্ভ অফিসে, শিবচর থানায় এবং ফরিদপুর কোতোয়ালী থানায় চাকুরী করি। আমি যখন পালং সার্কেলের ইনস্পেক্টর অফিসে রিডার তখন ঐ সার্কেলের ইনস্পেক্টর ছিলেন খান বাহাদুর বদরউদ্দিন আহমেদ সাহেব। তাঁহার বাড়ী ছিল বরিশাল জিলায়। তিনি একজন অত্যন্ত ভূঁড়ি মোটা লোক ছিলেন। তিনি একবারে ২/৩ টা ভাজী করা ইলিশ মাছ খাইতে পারিতেন। লোক হিসাবে তিনি অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। অনেক সময় তাঁহার সহিত একত্রে বসিয়া খাইতে হইত। বেশী করিয়া খাইতে পারি না বলিয়া তিনি বলিতেন "বেশী কইরা খাইবা না তো শরীর ওইবে ক্যামন কইর‍্যা?"

১৯৪৪ ইং সনে শিবচর থানায় চাকুরী করা কালীন আমার স্ত্রীকে প্রথম বাসায় নেই। সঙ্গে আমার পিতা গিয়াছিলেন। কাজের লোক হিসাবে বহরা গ্রামের ফাকের উদ্দিন নামক একটী ছেলেকে নেওয়া হইয়াছিল। তাহার বয়স তখন অনুমান ১০/১১ বৎসর ছিল। ফাকের অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিল। থানায় প্রত্যেকেই তাহাকে স্নেহ করিত। বছর দুইএর উপর সে আমার নিকট ছিল। পরে বাড়ী আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হয় এবং ম্যাট্রিক পাশ করিয়া চাকুরী করে। এখন সে মিরপুর (ঢাকা) বাসা করিয়া স্বপরিবারে বসবাস করিতেছে। চাকুরী জীবনে তাঁহার মত এত ভাল কাজের ছেলে আর কোন দিন পাওয়া যায় নাই।

১৯৪৫ইং সনে ফরিদপুর কোতোয়ালী থানায় চাকুরী করা কালীন, মার্চ্চ মাসে দারোগা পদে প্রমোশন পাই এবং ফরিদপুর সদরে ডি,আই,বি অফিসার হিসাবে আমাকে বদলি করা হয়। তখন দারোগার বেতন ছিল ৮০ টাকা হইতে ১৩০ টাকা ডি,আই,বি-র বিশেষ ভাতা ২৫ টাকা সহ আমার বেতন দাঁড়াইল ১০৫ টাকা প্রতি মাসে। ঐ সময়ে চরকমলাপুরে উপরতলায় এক কামরা এবং নীচ তলায় ৪ কামরা বিশিষ্ট একটা দালান প্রতিমাসে ৪০ টাকা ভাড়া ঠিক করিয়া স্বপরিবারে থাকিতাম। আমার পিতাও আমার সঙ্গে থাকিতেন। তখন রিজিয়া খুব ছোট ছিল। ঐ বাড়ীটার নাম ছিল আজিজ মঞ্জিল। পরবর্ত্তীতে ঐ বাড়ীটা চরমস্তুল গ্রামের মোমরেজ মিঞা ক্রয় করেন। তখন তিনি ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে চাকুরী করিতেন।

ডি,আই,বি,তে চাকুরী করা কালীন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার চাকুরীর উপর নামিয়া আসে এক মহাদুর্যোগের কালোছায়া।

ঘটনাটি এই প্রকার - ইং ১৯৪৩/৪৪ সনে যখন আমি শিবচর থানায় এ,এস,আই হিসাবে চাকুরীরত, তখন ঐ থানাধীন একটি গ্রামে (গ্রামটার নাম এখন মনে নাই, তবে গ্রামটি

'নারিকেল বাড়ীর চর' নামক একটা গ্রামের নিকট)। গেদা খাঁ ও মমিন খাঁ নামে দুই ভাই ছিল। তাহারা কুখ্যাত চোর ডাকাত বলিয়া পরিচিত ছিল এবং অবৈধ উপায়ে টাকা কামাইয়া বেশ ধনী হইয়াছিল। কালো টাকার গরমে, গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদের উপর প্রকাশ্যে এবং গোপনীয়ভাবে অকথ্য অত্যাচার চালাইতেছিল। অত্যাচারিত গ্রামবাসীরা কেহই এরজন্য থানায় অভিযোগ করিতে আসে নাই। স্থানটি থানা হইতে অনুমান ৬/৭ মাইল দুরে হইবে। ঐ সময়ে ঐ এলাকায় মাতবরের চর নামক গ্রামে জৈনদ্দিন মাতবর নামক একজন অত্যন্ত ধনী এবং প্রভাবশালী লোক ছিলেন। অত্যাচারিত গ্রামবাসীরা উক্ত গেদাখাঁ এবং মমিনখাঁর বিরুদ্ধে উক্ত মাতবর সাহেবের নিকট নালীশ দিলে তিনি উহাদিগকে চোরাদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া এলাকা হইতে তাড়াইয়া দিতে পরামর্শ দেন। তাহার পর একদিন এলাকায় কয়েক হাজার লোক একত্রিত হইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে উক্ত গেদা খাঁ মমিন খাঁর বাড়ী চড়াও করে এবং সমস্ত ঘরদরজা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া সব মালামাল লুটপাট করিয়া নিয়া যায়।

উহারা পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করে এবং থানায় মামলা দায়ের করে। থানায় দঃবিঃ ৩৯৫ "ডাকাতি" ধারা সহ অন্যান্য ধারায় এজাহার লওয়া হয়। মামলা তদন্ত করেন শিবচর থানায় তদানিন্তন ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ এবং সুদক্ষ দারোগা জনাব ইয়াছিন আলী মিঞা সাহেব। যেহেতু ঐ এলাকার প্রায় সকলেই এই ঘটনার সহিত জড়িত ছিল তাই এই মামলার স্বপক্ষে কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। ফরিদপুর জেলার তদানিন্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ এ, এইচ, এম, মাসুদ সাহেব নিজে ঘটনাস্থলে আসিয়াও কোন প্রমাণ পাইলেন না। কিন্তু তিনি ঘটনার কারণ অনুধাবন করিয়া তদন্তকারী দারোগা সাহেবকে গেদা খাঁ মমিন খাঁর পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের কাহিনী বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়া মামলা ফাইন্যাল রিপোর্টের নির্দ্দেশ দিলেন।

বিভাগীয় ডি,আই,জি এবং ডি,আই,জি সি,আই,ডির অবগতির জন্য সকল ডাকাতি মামলারই প্রগতি প্রতিবেদন পাঠাইতে হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশ্য দিবালোকে এতবড় একটা অন্যায় ঘটনা সংঘটিত হইল কিন্তু প্রমাণ নাই, এটাতো যুক্তিযুক্ত ভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। তাই ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রতিবেদনে দুষ্কৃতিকারীতের ঘটনা পূর্ব্ব সকল সন্ত্রাসী অপকর্ম্মের বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদেরকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী বলিয়া মন্তব্য করা হয়। দুষ্কৃতিকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া বিভাগীয় ডি,আই,জি পুলিশ সুপারের প্রতিবেদন সমর্থন করেন। কিন্তু ডি,আই,জি-সিআইডি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে ঘটনাটির মূল্যায়ন করিলেন। উভয় ডি,আই,জিই ইংরেজ ছিলেন। ডি,আই,জি-সিআইডি একরোখা লোক ছিলেন এবং প্রত্যেকেই তাহাকে ভীষণ ভয় করিত। তাহার যুক্তি হইল দুষ্কৃতকারীদের অতীতের সব সন্ত্রাসী অপকর্ম্মের ব্যাপার থানা পুলিশের জানা অবশ্যই উচিৎ ছিল এবং পূর্ব্বেই তাহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ছিল। থানা পুলিশের ব্যর্থতা এবং কর্ত্তব্য কাজে অবহেলার জন্য জন সাধারণ অতিষ্ট হইয়া নিজেদের হাতে আইন তুলিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে অতএব সংশ্লিষ্ট সকল পুলিশ কর্ম্মচারীই এই ঘটনার জন্য দায়ী।

ডি,আই,জি-সিআইডির এই যুক্তি ন্যায়সঙ্গত এবং আকট্যও বটে। কিন্তু ইহা শুধু একমাত্র থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ থানার ভাল মন্দের জন্য তিনিই সার্ব্বিকভাবে দায়ী এবং জবাবদিহি। সার্কেল ইন্‌স্পেকটর বা থানার অন্যান্য অফিসার বিশেষ করিয়া সামান্য এ,এস,আইকে উক্ত ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ কেহই খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু ডি,আইজি- সিআইডি সাহেব সার্কেল ইনস্পেকটরসহ ঐ সময়ে ঐ থানায় থাকা সকল অফিসারকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া সকলের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পুলিশ সুপারকে নির্দ্দেশ দিলেন। ঘটনার সময় সার্কেল ইন্‌স্পেকটর ছিলেন জনাব হাজী মোঃ জিল্লুর রহিম এবং থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা ছিলেন জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী মিঞা। চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ায় উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরই তাহারা উভয়েই অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তাহাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রমোশন পাইয়া আমি ডি,আই,বি-তে দারোগা হিসাবে কাজ করিতেছিলাম। ডি,আই,জি-সিআইডি নির্দ্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি হিসাবে আমাকে তিন মাসের জন্য Revert করা হইল এবং এ,এস,আই হিসাবে বোয়ালমারী থানায় বদলি করা হইল। এটা ছিল ১৯৪৫ইং সনের সেপ্টেম্বর মাস। উক্ত শাস্তির কথা যথারীতি ডি,আই,জি-সিআইডিকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ বৎসর দারোগা পদে (Confirm) স্থায়ী হওয়ার জন্য আমার মনোনয়ন প্রাপ্য ছিল এবং আমি একরকম নিশ্চিত ছিলাম যে ঐ বৎসরই আমি উক্ত পদে (Confirm) স্থায়ী হইতে পারিতাম। কিন্তু ভাগ্যের এমনই নির্ম্মম পরিহাস যে আমাকে নিম্ন পদে নামিতে হইল।

সময়ের চাকা ঘুরিয়া উক্ত শাস্তির মেয়াদ তিন মাস শেষ হইল। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার প্রমোশন দিয়া আমাকে মাদারীপুরে থানায় টাউন দারোগা হিসাবে বদলী করা হইল। পুলিশ সুপার প্রদত্ত আমার শাস্তি মোটেই উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া ডি,আইজি-সিআইডি মন্তব্য করেন এবং আমাকে স্থায়ী ভাবে (Permanently) এ,এস,আই পদে নামাইয়া দেওয়ার জন্য পুলিশ সুপারকে নির্দ্দেশ দেন।

তখন আবার আমাকে স্থায়ীভাবে এ,এস,আই পদে নামাইয়া সদরপুর থানায় বদ্‌লি করা হয়। তখন ছিল ১৯৪৬ সনের মে মাস। ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা সবই শেষ হইয়া গেল। আর প্রমোশন হইবে না; যতদিন চাকুরী করিব এ,এস,আই-ই থাকিতে হইবে, একথা চিন্তা করিতেও যেন পারি না। চাকুরী ছাড়িয়া দিবার কথা চিন্তা ভাবনা করিতে লাগিলাম। বন্ধু বান্ধবেরা সান্ত্বনা দিয়া হঠাৎ করিয়া চাকুরী না ছাড়ার পরামর্শ দিলেন। আমি পুলিশ সুপারের সহিত দেখা করিলাম। তিনি নূতন আসিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত আমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সান্ত্বনা দিয়া আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

সময় নিজ গতিতে চলিতে লাগিল। ১৯৪৬ সনের নভেম্বর মাস আসিল। তখন হাওয়া আবার আমার অনুকুলে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। তদানীন্তন রিজার্ভ অফিসার জনাব

মহিউদ্দিন আহমেদ সাহেব ১৯৪৭ সনের জানুয়ারী মাসে সারদা পুলিশ ট্রেইনিং কলেজে ট্রেইনিং এর জন্য যাইবেন। তাঁহার স্থলে রিজার্ভ অফিসে কাহাকে আনা যায়? ঐ সময়ে রিজার্ভে কাজ চালাইবার মত কোন দক্ষ অফিসার ঐ জেলায় ছিল না। পূর্ব্বে আমি যখন এ,এস,আই হিসাবে রিজার্ভ অফিসে ছিলাম তখন আমার করণীয় নির্দ্ধারিত কাজের সাথে সাথে উক্ত অফিস সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজই তদানীন্তন রিজার্ভ অফিসার বাবু মহাদেব চন্দ্র দাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে করিতাম। এই ভাবে রিজার্ভ অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ কর্ম্ম আমার শিখা হইয়াছিল। উক্ত দারোগা জনাব মহিউদ্দিন সাহেব ইহা জানিতেন। তাই তিনি তাহার স্থলে আমাকে ঐ অফিসে আনার জন্য তদানীন্তন পুলিশ সুপারের নিকট প্রস্তাব করেন এবং আমার উপর অযথা আরোপিত শাস্তির কথাও বলেন। এর পর আমাকে সদরপুর থানা হইতে রিজার্ভ অফিসে বদ্‌লি করা হয় এবং ২১/১১/৪৬ তারিখে আমি উক্ত অফিসে যোগদান করি। তাহার পর পুলিশ সুপার সাহেব উল্লিখিত ঘটনা সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখিয়া বিভাগীয় ডি,আই,জির নিকট এক লম্বা প্রতিবেদন পাঠান। প্রতিবেদনে আমার নির্দোষীতার কথা দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়। উপসংহারে লেখা হয় যে "মোটেও যদি তাহার কোন দোষ থাকিয়া থাকে, তারজন্য সে প্রচুর ভূগিয়াছে। (How ever if, at all, he had any fault, he suffered for that amply) এখন রিজার্ভ অফিসারের প্রয়োজন। সে ছাড়া বর্ত্তমানে রিজার্ভ অফিসে কাজ চালাইবার মত আর কোন অফিসার না থাকায় তাহাকে রিজার্ভ অফিসে বদলি করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার উপর আরোপিত শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে পুনরায় প্রমোশন দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক"।

এক সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত সুপারিশের অনুকূলে ডি,আই,জির আদেশ সম্বলিত চিঠি পাওয়া গেল এবং আমাকে দারোগা পদে প্রমোশন দেওয়া হইল। এইভাবে আমার চাকুরীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে যে অলংঘনীয় এক বিশাল প্রাচীর সৃষ্টি হইয়াছিল, অপার করুণাময় আল্লাহতালার রহমতে তাহা অপসারিত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে দুইজন প্রাক্তন রিজার্ভ অফিসার, বাবু মহাদেব চন্দ্র দাস ও জনাব মহিউদ্দিন আহ্‌মেদের অবদান এবং তদানীন্তন পুলিশ সুপারই মূখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহারা এখন জীবিত আছেন কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁহাদের নাম আজও আমি অতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি। ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সনের উল্লিখিত বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য দারোগা পদে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দুই বৎসর পিছাইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

ফরিদপুর রিজার্ভ অফিসে চাকুরী করা কালে ইং ১৯৪৭ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আবুর জন্ম হয় ফরিদপুর পুলিশ লাইনে অবস্থিত রিজার্ভ অফিসারের বাসায়।

ঐ বৎসর (১৯৪৭) জুন মাসে আই,জি,পির আদেশক্রমে দারোগা পদে স্থায়ী (Confirm) হওয়ার যোগ্য অফিসিয়েটিং দারোগাদের মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং অন্যান্যদের সহিত

আমিও মনোনয়ন পাই। ডি,আই,জি, ময়মনসিংহ জেলার পুলিশ সুপার এবং বরিশাল জেলার পুলিশ সুপার লইয়া গঠিত বোর্ডে, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল জেলার মনোনীত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। ঢাকা সেগুনবাগিচাস্থিত কমিশনার্স বিল্ডিং এ অবস্থিত ডি,আই,জির অফিসে ঐ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। অন্যান্যদের সহিত আমিও নির্বাচিত হই। আমার স্থান দ্বিতীয় ছিল। ঐ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং বরিশাল জিলা ঢাকা রেন্‌জের (Range) ভিতর ছিল।

ইংরেজী ১৯৪৭ সনের ১৩ই আগষ্ট দিবাগত রাত্রি ১২টা এক মিনিটের সময় অর্থাৎ ১৪ আগষ্ট হইতে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটে। জাতিগত ভিত্তিতে দুইটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত হয়, হিন্দুস্থান এবং পাকিস্থান।

ঐ সময়ে ফরিদপুর জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার মিঃ এ, এইচ, এম, মাসুদ (আই,পি) এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার বাশাইল থানার মিঃ আজিজুর রহমান তালুকদার। মিঃ মাসুদ দেশ বিভক্তির পর অপশন দিয়া হিন্দস্থানে চলিয়া যান। খুব সম্ভব তিনিই একমাত্র উর্দ্ধতন মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারী যিনি পাকিস্থান হইতে ভারতে গিয়াছিলেন। আমি তাহার এ সিদ্ধান্তের কথা জানিতে চাহিলে এই উক্তি করিয়া তিনি কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন যে পাকিস্থানে পক্ষপাতিত্ব; স্বজনপ্রিয়তা, তোষামদপ্রিয়তা প্রভৃতি পুরামাত্রায় চলিবে। হিন্দুস্থানে ঐসব একেবারেই চলিবে না তা নয় তবে পাকিস্থানের তুলনায় কম। এই সব কারণে তিনি ভারতে চাক্‌রী করার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন।

দেশ বিভক্তির পর এদেশে চাক্‌রীরত প্রায় সকল হিন্দুই এদেশ হইতে অপশন দিয়া ভারতে চলিয়া যায় এবং একইভাবে মুসলমান চাকুরীয়ারা ভারত হইতে পাকিস্থানে চলিয়া আসে। এই সব যাওয়া আসার ঝামেলা প্রভৃতি রিজার্ভ অফিসার হিসাবে আমাকেই সামাল দিতে হইত। তাই কাজের চাপ ঐ সময়ে এত বেশী ছিল যে অনেকদিনই অফিসে বসিয়া শুধুমাত্র চা-বিস্কুট খাইয়া সারাদিন কাজ করিতে হইত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৯৪৭ সনের জুন মাসে আমরা দারোগা পদে (Confirm) স্বায়ী হওয়ার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ নির্ব্বাচন বাতিল হইয়া যায়।

ঐ বৎসরই (১৯৪৭) ডিসেম্বর মাসে আবার অন্যান্যদের সহিত Confirmation এর জন্য আবারও মনোনয়ন দেওয়া হয়। ঐ সময়ে ফরিদপুর জেলা খুলনা রেন্‌জে চলিয়া যায়। তখন খুলনা রেন্‌জের ডি,আই,জি ছিলেন মিঃ সামসুদ্দোহা I.P.। ডি,আই,জি; ফরিদপুর এবং কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার লইয়া গঠিত বোর্ডে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া এবং খুলনা জেলার মনোনীত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয় খুলনা ডি,আই,জির অফিসে। অন্যান্যদের সহিত আমিও নির্বাচিত হই। এবারও আমার স্থান দ্বিতীয় ছিল। আমরা

যাহারা নির্বাচিত হইলাম তাহাদের প্রত্যেককেই ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত সারদায় ট্রেইনিং দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঐ সময়ে অফিসারের অপ্রতুলতা হেতু ঐ ট্রেইনিং মওকুফ করিয়া দেওয়া হয় এবং আমি ফরিদপুর রিজার্ভ অফিসেই কাজ করিতে থাকি।

১৯৪৮ সনের জুলাই মাসে তদানীন্তন আই, জি,পি মিঃ জাকির হোসেন আই,পি, সাহেব (তিনিই পূর্ব্ব পাকিস্থানের প্রথম আই,জি,পি ছিলেন) পূর্ব্ব বর্ণিত সকল অফিসারকেই স্ব স্ব জিলা হইতে অন্যান্য জেলায় বদ্‌লি করিয়াছিলেন। আমার বদ্‌লি হইয়াছিল ময়মনসিংহ জেলায় এবং ফরিদপুরেরই আবদুর রশিদ নামক অপর একজন দারোগার বদ্‌লি হইয়াছিল রংপুর জেলায়। উক্ত আঃ রশিদ রিজার্ভ অফিসে আমারই সেকেন্ড অফিসার ছিলেন। তিনি ডি,আই,জি দোহা সাহেবের মামাতো ভাই। তিনি রংপুর যাইতে অমত করায় ডি,আই,জি সাহেব তাহাকে খুলনা রিজার্ভ অফিসে এবং আমাকে কুষ্টিয়া রিজার্ভ অফিসে বদ্‌লির নির্দ্দেশ দিয়া আই,জি,পি সাহেবকে জানাইয়া দেন যে ঐ দুই জেলায় রিজার্ভ অফিসে কাজ করার মত উপযুক্ত কোন অফিসার না থাকায় এবং এই দুইজনই রিজার্ভ অফিসার হওয়ায় তিনি উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রশিদ মিঞা খুলনায় এবং আমি ১৬/৮/৪৮ তাং কুষ্টিয়া রিজার্ভ অফিসে যোগদান করি। কিন্তু আই,জি,পি সাহেব ডি,আই,জি দোহা সাহেবের উক্ত বদ্‌লির আদেশ নাকোচ করিয়া অবিলম্বে আমাকে ময়মনসিংহ এবং রশিদ মিঞাকে রংপুর জেলায় পাঠাইয়া দিতে নির্দ্দেশ দেন। রশিদ মিঞা খুলনা হইতে রংপুর চলিয়া যায় কিন্তু রিজার্ভ অফিসে কাজ করার মত অন্য কোন অফিসার না থাকায় কুষ্টিয়া জেলার তদানীন্তন পুলিশ সুপার জনাব আঃ সাত্তার সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দিতে বেশ কিছু দিন বিলম্ব করেন। ইত্যবসরে আমি ঐ অফিসের এ,এস,আই আবদুস সবুর মিঞাকে প্রশিক্ষণ দেই এবং অল্পদিনের মধ্যেই সে রিজার্ভ অফিস সংক্রান্ত সমস্ত কাজ আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এরপর তাহাকে দারোগা পদে প্রমোশন দেওয়াইয়া তাহার নিকট অফিসের চার্জ বুঝাইয়া দিয়া আমি ৪/১২/৪৮ তাং কুষ্টিয়া ত্যাগ করি। উক্ত আঃ সবুর মিঞার ব্যক্তিত্ববোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। পুলিশ সুপারের সহিত নানা কারণে প্রায়ই তাহার কথা কাটাকাটি হইত। কিছুদিন পর তিনি বিরক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় চাকুরী ইস্তেফা দিয়া নারায়নগঞ্জ আসিয়া পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ঐ ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। নারায়ণগঞ্জ দারোগার আরত নামে তাহার পাটের আরত পরিচিত ছিল। পাকিস্তান আমলে এক পর্য্যায়ে তিনি সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার বাড়ী টাংগাইল থানার গোমজানির নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে। তিনি তাহার বড়ভাই আঃ করিম সাহেবের নামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঢাকা শ্যামলি সিনেমা হলের দক্ষিণে রাস্তার মোড়ে তাহার একটা বড় দোতলা বাড়ী আছে। অতি সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

যাহা হৌক কুষ্টিয়া হইতে আমি ১৩/১২/৪৮ তাং ময়মনসিংহ জেলায় যোগদান করি। ইতি পূর্ব্বেই আমাদের সারদায় ট্রেইনিং মওকুফের আদেশ বাতিল করিয়া ১৯৪৯ সনের

জানুয়ারী মাসে ট্রেইনিং এর জন্য সারদা পুলিশ ট্রেইনিং কলেজে যোগদান করার জন্য নূতন আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত আদেশ বলে আমি ২/১/৪৯ তাং সারদা পুলিশ ট্রেইনিং কলেজে যোগদান করি।

৬ মাস ট্রেইনিং-এর পর জুলাই মাসের প্রথম দিকে ময়মনসিংহ জেলায় ফিরিয়া আসিলে আমাকে সেকেন্ড অফিসার হিসাবে কালিহাতী থানায় বদ্‌লি করা হয়। কালিহাতী থানায় যোগদান করি ১১/৭/৪৯ তারিখে। ঐ সময়ে ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন ধুবরিয়া নিবাসী জনাব মহিত উদ্দিন আহ্‌মেদ। তিনি অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। কালিহাতী থাকাকালীন নভেম্বর মাসে আমাকে দুর্গাপুর থানাধীন ঘোষগাও বর্ডায় আউটপোষ্টে দুইমাসের জন্য ডেপুটেশনে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু আমার পরিবারের সদস্যরা কালিহাতীতেই ছিল। আমার পিতা ঐ দুইমাস ওখানে ছিলেন। কালিহাতী থানা হইতে ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাসে O/C করিয়া আমাকে বদ্‌লি করা হয় ঘাটাইল থানায়। ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫২ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উক্ত থানায় O/C, ১৯৫২ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত কেন্দুয়া থানায় O/C, ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ঐ বৎসরেরই জুন মাস পর্য্যন্ত তারাইল থানার O/C, ঐ বৎসরেরই জুলাই হইতে ১৯৫৭ সনের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত হালুয়াঘাট থানার O/C এবং ১৯৫৭ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভৈরব থানার O/C হিসাবে চাকুরী করি। এরপর ১৯৫৯ সনে ময়মনসিংহ কোর্ট দারোগা হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর ঐ বৎসরই জুন মাসে O/C হিসাবে টাংগাইল থানায় বদ্‌লি হই। ১৯৬০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ঐ থানায় চাকুরী করার পর অসুস্থতা হেতু দীর্ঘ দিন ছুটি ভোগ করিয়া ১৯৬২ সনের মে মাসে O/C হিসাবে আমার বদ্‌লি হয় নান্দাইল থানায়। ঐ থানায় থাকাকালীন আমি এক তান্ডব চক্রের শিকার হই। ঘটনাটি এই রকম ছিলঃ-

ঐ সময়ে নান্দাইল এবং পাশ্ববর্ত্তী সকল থানায়ই হাট বসিত সন্ধ্যার পর এবং হাটে বেচাকেনা চলিত প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত। থানা হইতে অনুমান ৬/৭ মাইল দূরের এক কাপড়ের দোকানদার হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া, অবশিষ্ট কাপড়ের গাইট মাথায় করিয়া একাকী আনুমানিক রাত্রি ১২টার সময় বাড়ী ফিরিবার পথে কয়েকজন লোককে তাহার দিকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে সে কাপড়ের গাইট ফেলিয়া দৌড়াইয়া বাড়ী চলিয়া আসে। পরে লোকজন সঙ্গে করিয়া ঐস্থানে আসিয়া দেখে যে কাপড়ের গাইটটা ওখানে নাই। এ ব্যাপারে সে থানায় এজাহার করিতে যায় নাই।

ইহার বেশ কিছুদিন পর সি,আই,ডি বিভাগের Dy, S.P (ডি,এস,পি) জনাব ইয়ুসুফ আলী সরকার সাহেব অন্য কোন কাজ উপলক্ষে ঐ গ্রামে গেলে উক্ত ঘটনার কথা জানিতে পারেন। ঘটনা ক্রমে আমিও ঐদিন একটা মামলা তদন্ত করার জন্য নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ছিলাম। ডি,এস,পি সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া ঐ কাপড়ের দোকানদারের নিকট হইতে একটা চুরির ধারায় অর্থ্যাৎ দঃবিঃ ৩৭৯ ধারায় একটা এজাহার নিতে বলেন।

ডি,এস,পি সাহেবের কথামত আমি উক্ত ধারায় এজাহার নেই। এজাহারে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে ডি,এস,পি সাহেবের নির্দ্দেশানুযায়ীই ৩৭৯ ধারায় এই এজাহার নেওয়া হইল। পরে তদানীন্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নির্দ্দেশে উক্ত মামলার ধারা বদলাইয়া ৩৭৯ ধারার স্থলে ৩৯৫ ধারা (ডাকাতি) করা হয় এবং সঠিক ধারায় এজাহার না নেওয়ার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং রুজু করা হয় এবং আমাকে সেকেন্ড অফিসার করিয়া ময়মনসিংহ কোতালী থানায় বদ্‌লি করা হয়। কোতালী থানায় যোগদানের কিছুদিন পর আমার বদলি হয় ডি,আই,বি-তে (D.I.B)। ডি,আই,বি-তে যোগদান করি ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে উক্ত অপরাধের জন্য আমার বিরুদ্ধে প্রসিডিং (Procuding) আনা হইয়াছিল। সি,আই,ডির ডি,এস,পি জনাব ইউসুফ আলী সরকার আমাকে ৩৭৯ ধারায় ঐ এজাহার নিতে বলার কথা একেবারে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন। তিনি সত্য কথা বলিলে আমার বিরুদ্ধে হয়তো বা প্রসিডিংই রুজু হইত না। যাহা হৌক তদানীন্তন পুলিশ সুপার মিঃ আবদুল খালেক সাহেব উক্ত অপরাধে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তিস্বরূপ আমাকে ১-৭-৬৪ তারিখ হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত তারিখ হইতে আর আমার চাকুরী রহিল না।

পুলিশ সুপারের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আমি পরে ডি,আই,জির নিকট আপীল দায়ের করিলাম। ঐ সময়ে ঢাকা বিভাগের ডি,আই,জি ছিলেন জনাব সাদেক আহ্‌মেদ আই,পি, (I.P) তিনি অত্যন্ত দক্ষ এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন একজন পুলিশ কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি আমার প্রতি আরোপিত পুলিশ সুপার সাহেবের উক্ত শাস্তির আদেশ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অযৌক্তিক বলিয়া অতি কঠোর ভাষায় মন্তব্য করিয়া আমাকে ১-৭-৬৪ তারিখ হইতে অবিলম্বে পূনর্বহাল এবং ঐ তাং (১-৭-৬৪) হইতে পূনর্বহালের আদেশের তারিখ পর্য্যন্ত মধ্যকালীন সময় ছুটি হিসাবে গণ্য করার নির্দ্দেশ দেন। মাননীয় ডি,আই,জি সাহেবের উক্ত আদেশ মোতাবেক ৮-৪-৬৫ তারিখে আমাকে আবার চাকুরীতে বহাল করা হয়। এই প্রকার বিনা কারণে এবং বিনা দোষে বার বার হয়রানী ভোগ করায় চাকুরীর প্রতি আকর্ষণ একেবারে হারাইয়া ফেলি। তাই ঐ দিন (৮/৪/৬৫) তারিখ হইতেই স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করার জন্য পুলিশ সুপার সাহেবের নিকট আবেদন করি এবং তাহা গৃহীত হয়। ঐ দিন আমার চাকুরীর বয়স হইয়াছিল ৩০ বৎসর ২ মাস ৭দিন। তখনকার নিয়মানুযায়ী একজন সরকারী কর্ম্মচারী ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চাকুরী করিতে পারিতেন এবং ৩০ বৎসর চাকুরী করার পর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেন। আমার তখন বয়স হইয়াছিল ৫০ বৎসরের কিছু বেশী তাই আমি আরও ৫ বৎসর চাকুরী করিতে পারিতাম। বলাবাহুল্য যে ১-৭-৬৪ তারিখ হইতে ৭-৪-৬৫ তারিখ পর্য্যন্ত সময়ের বেতন ছুটির বেতন হিসাবে আমাকে দেওয়া হইয়াছিল।

এই হইল আমার দীর্ঘ ৩০ বৎসর ২ মাস এবং ৭ দিন চাকুরী জীবনের মোটামুটি ইতিহাস।

১৯৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী আমার চাকুরী হয়। তখন আমার বেতন ছিল প্রতি মাসে ২০/ টাকা। ঐ সময় প্রতিমন ভাল চাউলের মূল্য ছিল ২/ আড়াই টাকা এবং প্রতি ভরি সোনার মূল্য ছিল ২০/ কুড়ি টাকা। এই হিসাবে তখনকার ২০/ টাকা বর্তমানের (১৯৯৬) ৬০০০/ ছয় হাজার টাকার সমান দাঁড়ায়। কারণ প্রতিভরি সোনার দাম এখন ৬০০০/ ছয় হাজার টাকা ১৯৬৫ সনে যখন আমি অবসর গ্রহণ করি তখন আমার বেতন ছিল ৪০০ টাকার কিছু উপরে। তখন ময়মনসিংহের একমন উন্নত মানের 'বিরই' চাউলের মূল্য ছিল ১৮/ টাকা হইতে ২০/ টাকা।

আমি যখন অবসর গ্রহণ করি তখনকার সরকারী নিয়মানুযায়ী অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ মাসের গড় মাসিক বেতনের ৫০% শতাংশ অর্থাৎ অর্দ্ধেক পেনশন ধার্য্য হইত এবং মোট পেনশনের ১/৪ এক চতুর্থাংশের পরিবর্ত্তে কিছু টাকা এককালে দেওয়া হইত। আমি এককালে ৭০০০/ সাত হাজার টাকা নিয়াছিলাম। এরপর যে পেনশন বাকী ছিল তাহা ধাপে ধাপে বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে (১৯৯৬) ৭০২.০১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৫০/টাকা চিকিৎসা ভাতা সহ এখন (১৯৯৬) আমি মোট পেনশন পাইতেছি ৭০২.০১ টা কা।

এতক্ষণ আমার শৈশব এবং চাকুরী জীবনের কথা যথাসম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে মাঝে মাঝে কোন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এসবই মূল ঘটনা বহির্ভূত ব্যাপার। তবে হারাইয়া যাওয়া দিনের ঐ সব সুপরিচিত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ এবং তাহাদেরকে আমার লেখার মাধ্যমে কিছু দিনের জন্য হইলেও বাঁচাইয়া রাখার চেষ্টাই আমার উদ্দেশ্য।

ধারাবাহিকভাবে আমার এই জীবন কাহিনী লিখিতে যাইয়া ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে অতীত জীবণে ঘটিয়া যাওয়া অনেক ঘটনার কথাই উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই। তাই এখন আমি ঐ সব অপ্রকাশিত কিছু কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি।

দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল পুলিশ বিভাগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে চাকুরী করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আমার পুলিশ সুলভ বা দারোগাসুলভ আচরণের কোন উল্লেখ নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। একটা থানার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সার্ব্বিক এবং প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর। তাই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে, প্রয়োজনের তাগিদে সময় সময় ব্যক্তি বিশেষের সহিত আমাকে কঠোর আচরণ করিতে হইয়াছে এবং তাহার জন্য প্রায়ই নীরবে গিন্নির বকুনী হজম করিতে হইয়াছে। বিভিন্ন থানায় চাকুরী করা কালীন বিভিন্ন লোক আমার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের মন্তব্য প্রকাশ করিত। একটা মন্তব্যের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের একজন সদস্য কেন্দুয়া থানার জনাব তৈয়ব আলী খন্দকার সাহেবের মন্তব্য ছিল "দেবতার মধ্যে মহাকালী, আর দারোগার মধ্যে হায়াত আলী"। অবশ্য সৎলোকদের সহিত আমার আচরণ ছিল অত্যন্ত সৌজন্যমূলক এবং বন্ধুসুলভ। এলাকায় কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বাড়ী থাকিত; প্রয়োজনে কেবলমাত্র সেই সব বাড়ীতেই খাইতাম। যেখানে সেখানে যার তার বাড়ীতে অনুরোধ সত্যেও খাইতাম না। একদিন যাহার বাড়ীতে খাইতাম, তাহাকে নিজ বাসায় খাওয়ানোর সুযোগে থাকিতাম এবং সুযোগ পাইলেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতাম।

১৯৫১ সনে ঘাটাইল থানায় O/C থাকাকালীন গোপনসূত্রে খবর পাইয়া একদল ডাকাতকে ডাকাতী করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও করিয়াছিলাম এবং ইহার জন্য আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।

১৯৫৬ সনে হালুয়াঘাট থানায় O/C থাকার সময় জব্বার নামক এক ব্যক্তি ডাকাতী মামলায় ধৃত হওয়ার পর আমাদের হেফাজতে থাকাকালীন মারা যাওয়ায় আমি এবং আমার সেকেন্ড অফিসার জনাব খোরশেদ জাহ খুনের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আইনের জটিলতার ফাঁক দিয়া আমরা দুইজনই খোদার মেহেরবানীতে বাহির হইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রাথমিক তদন্তাবস্থায়ই খারিজ হইয়া যাওয়ায় আমাদেরকে আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয় নাই। মানুষের রচিত প্রচলিত আইন অনুসারে আমরা ন্যায়সঙ্গত কারণেই রেহাই পাইয়াছিলাম; কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার মহান আদালতের বিচারেও কি আমরা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিব? এরজন্য পরম দয়ালু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে সহস্র কোটীবার ক্ষমাভিক্ষা করিয়া মোনাজাত করি।

উক্ত দারোগা জনাব খোরশেদ জাহ্ মুর্শিদাবাদ জেলার লোক ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের লোক বলিয়া দাবী করিতেন। তিনি খুব ভাল ঘোড় সোওয়ার, দক্ষ সাইকেল চালক, সুদক্ষ মটর, ট্যাক্সি ইত্যাদি এবং হাতীও চালাইতে পারিতেন। উল্লিখিত মর্ম্মান্তিক এবং শোচনীয় ঘটনাটির জন্য তিনিই প্রকৃত পক্ষে দায়ী ছিলেন বলিয়া বলা চলে। এলাকার প্রায় সকল লোকই এই মামলায় আমাদিগকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে হালুয়াঘাট পাইলট হাইস্কুলের হেড্মাষ্টার জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ, তাঁহার চাচাতো ভাই জনাব আবদুর রউফ, নাটশালা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল আলী পঞ্চায়েত এবং মৃত জব্বারের নিজ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলবী আবদুল হাই সাহেব। তাঁহাদের নিকট আমরা বাস্তবিকই ঋণী। আজও তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া থাকি।

নৌকা ডুবির ঘটনা

আমার জীবনে ঘটিয়া যাওয়া সমস্ত ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা স্মরণীয় ঘটনার কথা বর্ণনা করিতেছি ঘটনাটি এই রূপঃ-

ইংরেজী ১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাস। আমি তখন ময়মনসিংহ জেলার ঘাটাইল থানার O/C (বড় দারোগা)। ঐ বৎসর ১৮/৯/৫১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পবিত্র বকরা ঈদ উপলক্ষে বাড়ী যাওয়ার জন্য ছুটি লইয়া ৯/৯/৫১ তারিখ বিকাল বেলা অনুমান ২টার সময় ঘাটাইল থানা হইতে স্বপরিবারে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ঐ সময়ে মেয়ে রিজিয়ার বয়স ৭-১/২ বৎসর, ছেলে আবুর বয়স ৫ বৎসর, মেয়ে সামসুনের বয়স ৩ বৎসর এবং মেয়ে মিন্টুর বয়স মাত্র ৯ মাস ছিল। সিদ্ধান্ত নিয়াছিলাম যে থানা হইতে গাড়ীতে কালিহাতী যাইয়া, কালিহাতী নদীতে থাকা থানার নৌকা যোগে টাংগাইল যাইব এবং ওখান হইতে অন্য নৌকা ভাড়া করিয়া বাড়ী যাইব। যাত্রা প্রাক্কালে একটা টেক্সি জাতীয় গাড়ীতে উঠার সময় সামসুন "ভয় লাগে ভয় লাগে" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। নিকটে দাঁড়াইয়া থাকা বাশেদ থানার সিপাই আবদুল রাশেদ খাঁ তাহাকে কোলে লইয়া নিকটবর্ত্তী টিউব অয়েল হইতে পানি খাওয়ানোর পর সে কিছুটা শান্ত হইলে, আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সে তখন কাঁপিতে ছিল। কালিহাতী পৌঁছিয়া নদীতে থাকা আমাদের থানার পোটল নৌকা যোগে পরের দিন (১০/৯/৫১) সকালে অনুমান ৯টার সময় টাংগাইল পৌঁছিলাম। নৌকার মাঝিরা শহরের নিকট দিয়া বহিয়া যাওয়া খরস্রোতা খালের পাড়ে নৌকা বাঁধিয়া রাখিল। ওখান হইতে বাড়ী যাওয়ার জন্য নৌকা ভাড়া করার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন নৌকা পাওয়া গেল না। জানা গেল সে এলাসিন ঘাটে প্রচুর নৌকা আছে, সেখানে গেলে ভাড়ার নৌকা পাওয়া যাইবে। তখন থানার নৌকায়ই এলাসিন ঘাটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুধ, মাছ ইত্যাদি কেনার জন্য একজন মাঝি সঙ্গে নিয়া বাজারে গেলাম। বাজার হইতে নৌকায় ফিরিয়া জানিতে পারিলাম যে আবু নৌকা হইতে পানিতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং নৌকার মাঝি সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিয়াছিল। এটা নিশ্চিত যে মাঝির তৎপরতার জন্যই আল্লাহর রহমতে আবুর জীবন রক্ষা হইয়াছিল, নচেৎ কি যে হইত, তাহা কেবল পরম দয়ালু আল্লাহই জানেন ভাল। যাহা হোক ঐ নৌকায়ই এলাসিনের দিকে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে নৌকায়ই রান্না-বারা খাওয়া খাদ্য হইল। এলাসিন পৌছার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আবহাওয়া বেশ খারাপ হইয়া পড়িল। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সহ পূর্ব্বদিক হইতে বেগের সহিত বাতাস বহিতে লাগিল। অনুমান ১২ টার সময় আমাদের নৌকা এলাসিন পৌছিল। মাঝিরা বেশ নিরাপদ একটা স্থানে নৌকা বাঁধিয়া রাখিল। বাতাসের বেশ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই মাল্লার একটা বেশ লম্বা রকমের ছৈযুক্ত নৌকা ভাড়া করিয়া সঙ্গে থাকা মাল পত্র ঐ নৌকায় উঠান হইল।

কিন্তু আমরা সকলে আমাদের নৌকায়ই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নৌকা যোগে বিশাল ধলেশ্বরী নদী পাড়ী হইতে হইবে। নদী অত্যন্ত অশান্ত, ভীষণ ঢেউ এর গর্জ্জন শোনা যাইতেছে বহুদূর পর্য্যন্ত। এমতাবস্থায় নদী পাড়ি দিতে সাহস হইতেছিল না; কিন্তু ভাড়া করা নৌকার মাঝিরা বারবার আমাকে অভয় দিতে লাগিল এবং উৎসাহিত করিতে লাগিল। পরে আমি "বাড়ী মুখো বাঙ্গালী" তাহাদের কথায় রাজী হইলাম। ঐ সময় নদীর অপর পাড়ে যাইতে ইচ্ছুক অনেক নৌকা ঐ ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল, কেহই নদী পাড়ি দিতে সাহস পাইতেছিল না।

আমরা সকলেই থানার নৌকা হইতে ঐ নৌকায় উঠার পর মাঝিরা পাল ঠিক করিয়া পাড়ি ধরিল। নৌকা নদীতে আসামাত্রই নদী যে কি ভয়ঙ্কর রুপ ধারণ করিয়াছে তাহা পুরাপুরি উপলব্ধি করিতে পারিলাম এবং আমি যে কত বড় ভুল করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এখনতো সে ভুল সংশোধনের কোন উপায়ই নাই। ভয়ে আবুর মায়ের চেহারা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং আমারও অবস্থা একই রকম। যাহা হৌক প্রবল ঢেউএর উপর দিয়া পালের সাহায্যে নৌকা উথাল পাথাল করিতে করিতে ক্ষিপ্ত বাঘের মত চলিতে লাগিল, প্রতি মূহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল যে এই বুঝি নৌকা ডুবিয়া গেল। নদীর প্রশস্ততা তখন ঐ স্থানে অনুমান এক মাইলের উপর ছিল। নৌকা নদীর তিন চতুর্থাংশ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। সামনে মাত্র এক চতুর্থাংশ নদী। তার পরই নৌকার গন্তব্যস্থান, নদীর পাড়। যে গতিতে নৌকা চলিতেছে তাহাতে আর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই নিরাপদস্থানে পৌঁছা যাইবে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আচম্‌কা একটা প্রবল ঝাপ্‌টা বাতাসে নৌকার পালের উজান দিকের অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের (বাম পাশের) রশি ছিড়িয়া নৌকা সত্যি সত্যিই ডুবিয়া গেল। ঐ সময় আমি নৌকায় ছৈএর সামনের দিকে বসা ছিলাম এবং আবু আমার কাছেই হাফ্‌প্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জী পরা অবস্থায় ঘুমন্ত ছিল। আবুর মা মিন্টুকে কোলে নিয়া রিজিয়া এবং সামসুন সহ ছৈয়ের ভিতর বসা ছিল।

নৌকা ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই তরিৎ গতিতে আমি আবুকে ধরিয়া নৌকার ভাসমান ছৈয়ের উপর বসাইয়া নৌকার একজন মাঝিকে উহাকে ধরিয়া রাখিতে বলিলাম এবং ছৈয়ের পানির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া আবুর মা এবং অপর তিনজনের খোঁজে ডুব দিয়া ছৈয়ের ভিতরে গেলাম কিন্তু হাতরাইয়া কাহাকেও পাওয়া গেল না। অতিপ্রিয় এবং অশেষ স্নেহ আদরের চার চারটা অতি আপন জন মূহূর্ত্তের মধ্যে নিজ চোখের উপর আমারই ভুলের কারণে চির দিনের জন্য হারাইয়া গেল। এ অনুভূতি কেবলমাত্র হৃদয় দিয়াই অনুভব করা যায় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা মোটেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হইয়া পানিতে ডুবিয়া যাওয়াইতো অতি স্বাভাবিক। কিন্তু মহান আল্লাহ পাক এই অতি কঠিন, করুণ এবং দুঃসময়ে বাস্তবতাকে সহজভাবে মানিয়া লইবার শক্তি ঐ মূহূর্ত্তে আমাকে দিয়াছিলেন। যাহার কারণে আমার মস্তিষ্ক বলিতে গেলে একেবারেই স্বাভাবিক ছিল এবং ঐ সময়ে আমার করণীয় সকল কাজই করিতে পারিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে ঐ ঘটনার কথা

মনে হইলে আমার মন যে কি রকম হয় তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যাহা হৌক ডুব দিয়া কাহাকেও না পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি ছৈয়ের উপরে উঠিয়া আবুকে ধরিলাম। ঠিক এই মূহূর্তে নৌকাটা ছৈ ইহতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং আবুর মাতা মিন্টুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রিজিয়াকে এক পাশে ও সামসুনকে অপর পাশে লইয়া ছৈয়ের নিকটে ভাসিয়া উঠিয়া ছৈ ধরিয়া ফেলিল। আমি তখন তড়িৎ গতিতে ঐ তিনজনকে দুই পাশে আমার দুই বাহু বেষ্টনীর ভিতর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বসাইয়া রাখিলাম। ওদের মাকেও ছৈয়ের উপরে উঠিতে বলায় সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল "আমাকে মরিতে দেন ওদের বাঁচান", হায়রে মাতৃ স্নেহ! নিজের জীবনকে মৃত্যুর নিকট জিম্মি করিয়া সন্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এ এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেও ছৈয়ের উপরে উঠিলে ছৈ তলাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সে ছৈয়ের উপরে উঠিতে অমত করিয়াছিল। নৌকায় একটা খাসী বাধা ছিল। নৌকা ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়া রশি ছিড়িয়া খাসীটাও ছৈয়ের উপর উঠিয়াছিল। নৌকা ডুবার পর আবুকে ছৈয়ের উপর তোলা, আমার পানিতে ডুব দেওয়া এবং পরে ছৈয়ের উপর উঠা, নৌকা ছৈ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া, আবুর মায়ের মেয়েদের সহ ছৈয়ের নিকট ভাসিয়া উঠা এবং মেয়েদেরকে ছৈয়ের উপরে তোলা এইসব ঘটনা একের পর এক এত দ্রুত গতিতে সংঘটিত হইয়াছিল যে একটার পর অপরটার সময়ের ব্যবধান নিরূপণ করা কঠিন। মনে হইল যেন সমস্তই একই সাথে ঘটিয়া গেল।

ছৈ আমাকে; আবু, সামসুন ও মিন্টুকে এবং খাসীটাকে পিঠে নিয়া অজানা গন্তব্যের দিকে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আবুর মা ছৈয়ের একদিকে এবং একজন মাঝি ছৈয়ের অপর দিকে ছৈ ধরিযা ভাসিয়া চলিল।

ছৈ বিহীন নৌকাটাও স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। একজন মাঝি নৌকার সহিত ছিল। নৌকাটা ছৈয়ের পার্শ্ব বরাবরই ছিল কিন্তু ছৈ হইতে বেশ কিছুদূরে। সবাইকে লইয়া ছৈটা স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার সময় ক্রমে ক্রমে নদীর কিনারার কাছাকাছি হইতেছিল।

ঐ খরস্রোতে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল ধলেশ্বরী নদীতে আশা নিরাশার সন্ধিক্ষণে বাধ্যতামুলক ছৈ বিহারের অনুমান আধা ঘন্টা পর, নদী হইতে নাগর পুরের দিকে প্রবাহিত খালের স্রোতের টানে ছৈটা উক্ত খালের ভিতরে প্রবেশ করিল। এই ভাবে ছৈয়ের চলার দিক পরিবর্তন হইল। এতক্ষণ পূর্বদিকে যাইতেছিল, এখন দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করিল এবং আমাদের স্তিমিত আশার আলো উজ্জ্বল হইল। বেশ কিছুক্ষণ পর উক্ত খালের কিনারায় অল্প পানিতে আসিয়া ছৈখানা ঠেকিয়া গেল। আল্লাহ পাকের অপার মহিমায় আমরা সবাই তখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত। নিকটেই একটা বালুময় চরের মত কতকটা শুকনা জায়গা ছিল। আবুর মাতা পানি হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে ঐ স্থানে যাইয়া বসিয়া পড়িল, কারণ সে তখন এতই দুর্ব্বল যে দাঁড়াইয়া থাকার মত অবস্থা তাহার ছিল না। তাহার পরণের কাপড় একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল।

এরপর মিন্টুকে আমি তার কোলে দিলে, মিন্টুকে বাঁচান যাইবে না বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মিন্টু তখন ঠান্ডায় একেবারে মরার মত হইয়া গিয়াছিল। বুকের দুধ খাওয়ানোর পর সে কিছুটা সুস্থ হয়।

ছৈখানা ঠেকিয়া যাওয়ার পরপরই আমার একটা বড় রকমের চামড়ার সুটকেস এবং নৌকায় থাকা একটা তক্তা খাল দিয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মাঝি উহা তুলিয়া আনে। ঐ সুটকেসে আমার কাপড় জামা ইত্যাদি ছিল। সবই ভিজিয়া গিয়াছিল, এই সময় ৩/৪ জন লোক যাহারা নিকবর্ত্তী চরে ঘাস কাটিতেছিল, বেশ বড় রকমের একটা ছৈওয়ালা নৌকা নিয়া আমাদের নিকটে আসিল এবং আবু, রিজিয়া ও সামসুনকে তাহাদের নৌকায় নিয়া ওদের শরীর মাথা মুছাইয়া তাহাদেরই কাপড় প্রত্যেকের গায়ে দিয়া বসাইয়া রাখে। আবু তখন বলে "আব্বা আমার কলের গান কোথায়?" আর একটা কিনিয়া দিব বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করি। ঠিক এই মূহুর্ত্তে নৌকার মাঝিটা হামাগুড়ি দিয়া ছৈয়ের নিকট পানির ভিতর হইতে একটা গ্রামোফোন তুলিয়া আনিল এবং দেখা গেল ওটা আমাদেরই গ্রামোফোন যাহা নৌকায় রাখা ছিল। আমিতো একেবারে অবাক, গ্রামোফোন এখানে কি করিয়া আসিল?

এরপর পাল তোলা একটা নৌকা অতিদ্রুত বেগে নদী পার হইয়া আমাদের নিকট পৌছিল। নৌকার আরোহী ভদ্রলোকটি আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত ভাবে আমাদের তখনকার হালহকীকত দেখিয়া এবং শুনিয়া যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তিনি নদী পার হইবার সময় একটা ট্রাঙ্ক উজান দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছেন। তিনিই তখন তাহার নৌকার একজন মাঝিকে উক্ত ট্রাঙ্কের খোজে পাঠাইয়া ছিলেন। অনুমান এক মাইল দূরে কিনারায় আটকাইয়া থাকা অবস্থায় পাইয়া সে ট্রাঙ্কটি লইয়া আসিল। ঐ ট্রাঙ্কের ভিতর সবারই জামা কাপড় ইত্যাদি ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় ট্রাঙ্কের ভিতর একটুও পানি প্রবেশ করে নাই এবং জামা কাপড় সবই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। উক্ত ভদ্রলোকটির বাড়ী নাগরপুরের নিকট কোন গ্রামে। তিনি গোপালপুরের দিকে কোথাও সেনিটারী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনিও বাড়ী আসার জন্য ভাড়াটিয়া নৌকায় এলাসিন ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের নৌকা ডুবা দেখিয়া আমাদের সাহায্যার্থে তিনি তার নৌকার মাঝিদেরে ঐ অবস্থায় নদী পার হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের পর মানিকগঞ্জ জনাব জয়নাল আবেদীন সাহেবের বাসায় তাঁহার সহিত আমার একদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি উক্ত জয়নাল আবেদীন সাহেবের একজন আত্মীয়।

আমরা ঐ স্থানে পৌছার অনুমান এক ঘন্টা পর ডুবিয়া যাওয়া নৌকার সহিত থাকা মাঝিটা উক্ত নৌকা লইয়া আমাদের নিকট পৌছিল। নৌকাটি অনুমান দেড় মাইল স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার পর কিনারায় আসিলে স্থানীয় লোকজনদের সাহায্যে তোলা হইয়াছিল। নৌকা ডুবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হইতেছিল এবং প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছিল। তখন বৃষ্টি ও বাতাস কমিয়া গিয়াছে এবং বেলাও ডুবু ডুবু প্রায়। উক্ত

ভদ্রলোকটি উপস্থিত লোকদের সাহায্যে ছৈটা নৌকায় তুলিবার জন্য ছৈয়ের ভিতরে থাকা তোষকে হাত দিয়াই একেবারে চীৎকার করিয়া বলিলেন "এইযে আপনার বন্দুক"। বন্দুকও পাইলাম। কেবলমাত্র একটা নুতন মশারী ছাড়া আর সব জিনিষই পাওয়া গেল।

ছৈ নৌকায় উঠাইবার পর আমরা সকলে আবার ঐ নৌকায় উঠিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যে নাগরপুর থানায় যাইয়া স্বজাতীদের সহিত রাত্রি যাপন করিব। ঐ সময়ে ঐ স্থানের অনুমান এক মাইলের মধ্যে কোন জনবসতি ছিল না। অনুমান এক মাইল দূরে আররা ভাররা নামক গ্রামের তদানীন্তন এক জমিদার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় ঐ বাড়ীর বেশ বয়স্ক এক ভদ্রলোক তাহার বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়াইতে বলিলে, তাহার বাড়ীর ঘাটে নৌকা ভিড়ান হইল। তিনি আমাদের হালঅবস্থা দেখিয়া এবং সবকিছু শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি অতি আনন্দের সহিত তাহার কথায় রাজী হইলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহুলোক আসিয়া ঘটনার কথা শুনিয়া এবং আমাদের তখনকার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ এবং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রায় সকলের চোখেই পানি। ঐ সময় বেলা ডুবিয়া গিয়াছে। উক্ত ভদ্রলোকের আদেশে আমাদের সকল ভিজা জিনিষপত্র নৌকা হইতে বাড়ীতে উঠান হইল এবং বাহির বাড়ীর একটা দালানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হইল। ছেলে মেয়েরা সবাই একেবারে নিস্তেজ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আবু এবং আমি ছাড়া আর সকলেরই প্রচুর পানি খাওয়ার দরুণ পেট ফুলিয়া গিয়াছিল। রাত্রি অনুমান ৯ টার সময় বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকের ব্যবস্থা অনুযায়ী এক মুসলমান বাড়ী হইতে মুরগীর গোস্তসহ খাবার আসিল এবং অতি সামান্য কিছু খাইলাম।

রাত্রে আমি এবং আবুর মাতা ঘুমাইতে পারিলাম না। চোখ বুজিলেই নৌকা ডুবির ঐ ভীষণ দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে আমি তখন আত্ম বিশ্লেষণ বা আত্ম সমালোচনা করিতে লাগিলাম। থানার যে নৌকাটি নিয়া এলাসিন আসিয়াছিলাম উহা 'বজরা' রকমের একটা বেশ বড় পোটল নৌকা। দুইটি কামরা, খরখরি জানালা এবং টয়লেটও ছিল নৌকায়। আমার নিকট টাকা পয়সাও ছিল। এমতাবস্থায় ঐ নৌকায় স্বপরিবারে এলাসিন ঘাটে দুই একদিন কেন, দুই এক মাস থাকিলেও কোনই অসুবিধা হইত না। তবে কেন আমি ঐ রকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় শিশু ছেলে মেয়ে নিয়া নদী পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য আমি সবাইকেই চিরতরে হারাইতে বসিয়াছিলাম এর জবাবতো আমাকেই দিতে হইবে। নিজের কাছে নিজেই আমি জবাবদীহি। এটা যে কত বড় একটা নির্বুদ্ধিতা, অপরিণামদর্শীতা ও অতি সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি হীনতার কাজ হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দংশিত হইতে লাগিলাম। আমাকে এর জন্য অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী বলিলেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবেনা। এর জন্য আমি নিজেই নিজের নিকট লজ্জিত, ধিক্কৃত, অনুতপ্তও বটে। বিবেকের দংশনে অব্যাহত ভাবে আমি দংশিত ও ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিলাম। রাত্রি যেন আর পোহায়

না। যাহা হৌক পরের দিন ভোরে বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক ভাল একটা পানসি নৌকা ভাড়া করিয়া দিলেন। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকুল থাকায় বাড়ী পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। ধলেশ্বরীর খালে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল বলিয়া আবুই সর্ব্ব প্রথম তাহার দাদুকে জানাইল।

যাত্রার প্রাক্কালে সামসুনের অস্বাভাবিক আচরণ এবং টাংগাইলে আবুর পানিতে পড়িয়া যাওয়াটা কি এই মহাবিপদের পূর্বাভাস ছিল?

এই নৌকা ডুবির ঘটনা আজও আমার স্মৃতিপটে অম্লান, তাই এই ঘটনার বিবরণে কল্পিত কোন কিছু লিখা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করার কোন অবকাশই থাকিতে পারে না। তবুও এমন কয়েকটি বিতর্কিত বিষয় আছে যাহার যথার্থতা প্রমাণের দাবী রাখে। সব স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক ঘটনা একমাত্র মহান আল্লাহই সংঘটিত করিয়া থাকেন কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনাকে বিশ্বাস যোগ্যতার আওতায় আনার জন্য তাঁহার দেওয়া কিছু অছিলা থাকে।

বিতর্কীত বিষয়গুলি হইতেছেঃ-

১। নৌকার ছৈ নৌকার সহিত বাঁধা থাকে। ইহা নৌকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল কেমন করিয়া? এর উত্তর ছৈটা নতুন তৈরী করা হইয়াছিল এবং উহা নৌকার সহিত মোটেই বাঁধা ছিল না। কাজেই নৌকাটা ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউ এর আঘাতে নৌকা ছৈ হইতে আলাদা হইয়া গিয়াছিল।

২। একটা মেয়ে মানুষ তিন তিনটা শিশু মেয়েসহ ভাসিয়া উঠিল কি করিয়া ? এ প্রশ্নের জবাব বলা যায় যে, ছোট শিশুটা তার মায়ের কোলে ছিল এবং অপর দুইজন নৌকা ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই নিকটে থাকা তাহাদের মাকে শক্তভাবে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। বিপদের সময় বিশেষ করিয়া পানিতে পড়িলে নিকটে যাহা পায় তাহাই তাহার বাঁচার অবলম্বন স্বরূপ শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলে। ইহা সমস্ত প্রাণী কুলের সহজাত ধর্ম এবং ইহা পরীক্ষিত সত্য। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। নৌকাটা ছৈ হইতে আলাদা হওয়ার সময় উহারা পানির উপরের স্তরে ছিল, তাই উহাদের ভাসিয়া উঠা সম্ভব ছিল। নৌকা ছৈ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইলে উহাদের চারিজনেরই মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।

৩। বন্দুক ও গ্রামোফোন ভাসমান বস্তু নয়। নৌকা ডুবার সাথে সাথেই ঐ স্থানেই ঐ সব ডুবিয়া যাইবার কথা, কিন্তু তাহা না হইয়া কথিত স্থানে ঐ সব কেমন করিয়া আসিল ? এ প্রশ্নের উত্তর - নৌকায় মোটা খাকী কাপড়ের বেশ বড় রকমের একটা তোষক পাতা ছিল এবং তাহার উপরে কয়েকটা বালিশ ছিল। ঐ তোষকের উপর গ্রামোফোন এবং পাশাপাশি থাকা দুইটা বালিশের উপরে বন্দুকটা রাখা ছিল। নৌকা ডুবার সঙ্গে সঙ্গেই পানির চাপে তোষকের গতি ঊর্দ্ধমূখী হয় এবং উহার উপরে থাকা সবকিছু নিয়া ছৈয়ের সহিত ঠেকিয়া থাকে। ছৈয়ের উপরে একটা খাসি এবং আমরা ছোট বড় চারজন লোক থাকায় স্বাভাবিক কারণেই ইহার গতি নিম্নমুখী হয় এবং পানির চাপে উক্ত তোষকের গতি থাকে ঊর্দ্ধমুখী এই প্রকার পরস্পর বিরোধী দুই চাপের মধ্যে আটকিয়া থাকে বন্দুক এবং গ্রামোফোন। ছৈ

যখন অল্প পানিতে ভাসিয়া মাটির সহিত ধাক্কা খায় তখন গ্রামোফোনটা পিছলাইয়া সরিয়া যায় কিন্তু বন্দুকটা বালিশের উপরেই থাকিয়া যায়। তোষকের ঐ উর্দ্ধমুখী গতির কারণেই আমরা ছৈয়ের উপরে থাকা সত্ত্বেও উহা পানিতে তলাইয়া যায় নাই।

নৌকা ডুবার স্থানটা এলাসিন ঘাট হইতে অনুমান এক মাইলের উপর হইবে। তাই ঐ স্থানের লোকেরা নৌকা ডুবিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কি হইল তাহা উহাদের পক্ষে এতদূর হইতে দেখা সম্ভব ছিল না। তাই স্বভাবতই তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ছেলে মেয়েসহ সকলেই ডুবিয়া মারা গিয়াছি। তখন এই সংবাদ অতি দ্রুত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমাদের থানার নৌকার মাঝিরাও ইহা দেখিয়াছিল। তাহারা ঐ রাত্রেই টাংগাইল থানায় সংবাদ দিল। থানা হইতে কয়েকজন সিপাইসহ একজন দারোগা আমাদের লাশ উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। খবর পাইয়া ঘাটাইল থানা হইতে সিপাহি আঃ বাশেদ খাঁ এবং অপর একজন সিপাহি ঘটনাস্থলে আসিয়াছিল। প্রকৃত সমস্ত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহের পর একজন সিপাহি থানায় চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু উক্ত আঃ বাশেদ খাঁ আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। ঘাটাইল থানার শেখ শিমুল গ্রামের জনাব রিয়াজ উদ্দিন মিঞা এবং ব্রাহ্মণশ্বশান গ্রামের জনাব আঃ গফুর মিঞাও কয়েক দিন পর আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

আমার এই নৌকা ডুবির প্রথম সংবাদ অর্থাৎ নৌকা ডুবিয়া স্বপরিবারে মারা গিয়াছি শুনিয়া ঘাটাইল থানার অধিবাসীদের ভিতর এক রকম প্রতিক্রিয়া এবং পরের সংবাদে আমরা মালামালসহ সকলেই বাঁচিয়া গিয়াছি শুনিয়া ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। উভয় সংবাদের প্রতিক্রিয়াই অত্যন্ত আশ্বর্য্যজনক। ঐ সব লিখিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে বিরত রহিলাম।

নদীতে নৌকা ডুবির ঘটনা অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এই প্রকার অলৌকিক ভাবে জানমালসহ উদ্ধার পাওয়ার কথা শুনি নাই। ইহা সত্যিই এক অতি আশ্চর্য্য বিরল ঘটনা। ইহার জন্য আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের দরবারে সহস্রকোটিবার মোনাজাত করি।

অবসর গ্রহণের পরবর্ত্তী ঘটনা

এখন আমি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলিতেছি। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নান্দাইল থানা হইতে ময়মনসিংহ কোতালী থানায় বদলি, হওয়ায় পর হইতে আমি স্বপরিবারে ঐ শহরের পুরোহিত পাড়ার জনৈক "রিজভি" সাহেবের একটা বাসায় ভাড়াটিয়া হিসাবে ছিলাম। ১৯৬৫ সনের এপ্রিল মাসে যখন অবসর গ্রহণ করি

তখন "আবু" ময়মনসিংহ কলেজে এবং সামসুন ও মিন্টু মহাকালী পাঠশালা নামক উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছিল। ঐ কারণে ১৯৬৬ সনের মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমাকে ঐ স্থানেই থাকিতে হইয়াছিল।

অবসর গ্রহণের সময় আমার হাতে তেমন কিছু টাকা পয়সা ছিল না। দুইতিন মাসের ভিতরই জি,পি ফান্ডের টাকা, ডাকবিভাগের জীবন বীমার টাকা এবং এককালীন কিছু পেনশনের টাকা পাইলাম। মোট ১৬/১৭ হাজার টাকা হইবে। তখন আমার বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সিদ্দিকের অনুরোধে পাটের ব্যবসা করার জন্য তাহাকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হইল। ঐ সময়ে দশ হাজার টাকা মূলধন নিয়া যে কোন ব্যবসাই করা যাইতে পারিত। সিদ্দিক ঐ টাকা দিয়া গ্রামের জলিল সেখের ছেলে তাহেজ শেখকে সঙ্গে নিয়া পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিল। পরিণামে ব্যবসায় লোকসান হওয়ায় উক্ত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ধান চাউলের কারবার ধরিল। এবারও উক্ত তাহেজ তাহার সঙ্গে ছিল। এই ব্যবসায়ও কোন লাভ না হইয়া লোকসান হইল এবং এই ব্যবসাও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তখন আমার ভুল বুঝিতে পারিলাম। সিদ্দিককে তাহার শৈশব কাল হইতেই অত্যন্ত স্নেহ করিতাম এবং তাহার প্রতি আমার বিশ্বাসের মূল ছিল অতি গভীরে, তাই ঐসব লোকসান স্বাভাবিক লোকসান বলিয়াই ধারণা করিয়া ছিলাম।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্বার্থে মানিকগঞ্জ টাউনে থাকা মনস্থ করিয়া ১৯৬৬ সনের মে মাসের শেষের দিকে স্বপরিবারে মানিকগঞ্জ আসিয়া জনাব জয়নুল আবেদীন সাহেবের নবনির্মিত বর্তমান বাসায় উঠি। ঐ বাসা পূর্বেই ঠিক করা হইয়াছিল। বাসার ভাড়া প্রতি মাসে ৭০ টাকা তিনিই ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন।

তৈরী বাড়ী অথবা বাড়ী করার জন্য উপযুক্ত জায়গার খোঁজ করিতে থাকিলে উক্ত জয়নুল মিঞা সাহেব তাহার বাড়ী সংলগ্ন পূর্ব দিকের ৮ আট ডেসিমেল জমি খরিদ করার জন্য উপদেশ দেন। ঐ জমির মালিক ছিলেন বেউথারই জনাব ইন্তাজ আলী মাতবর। মাটি কাটিয়া নেওয়ার দরুণ প্রায় সম্পূর্ণ জমিটাই একটা গভীর পুকুরে পরিণত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ঐ জমির উপর বাড়ী করিতে হইলে অনেক মাটির প্রয়োজন হইবে এবং তাহার জন্য বহু টাকা খরচ করিতে হইবে, বলিয়া প্রথম আমি জয়নুল মিঞা সাহেবের পরামর্শে ঐ জমি খরিদ করিতে অমত প্রকাশ করি। অবশ্য পরে আমি রাজী হইলে উক্ত জয়নুল মিঞা সাহেবই ৪০০/- (চারিশত) টাকায় আমাকে এই জায়গা কিনিয়া দেন। ছেলে মেয়েদেরকে মিষ্টি কিনিয়া দেওয়ার জন্য আমি আরও ২৫ টাকা ইন্তাজ মাতব্বর সাহেবকে দিয়াছিলাম। দলিল রেজিষ্ট্রারী হইয়াছিল ১৬/৭/৬৬ তারিখে। ঐ সময়ে বেউথা হইতে উত্তর দিকে জনাব বেদার বক্ত মোক্তার সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার দুইধারে কোন বাড়ীঘর ছিল না, এমন কি বর্তমান ফায়ার সার্ভিসের দালান কোঠাও নয়। বেউথা এমনকি মানিকগঞ্জের সর্বত্রই বাড়ী করার জন্য প্রচুর জায়গা পাওয়া যাইত এবং মূল্যও ছিল খুবই কম। যাহা হোক ১৯৬৭ সনের প্রথম দিকে বিভিন্ন স্থান হইতে মাটি আনিয়া

উক্ত পুকুর ভরাট করিতে বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর ১৯৬৯ সনের শেষের দিকে বাড়ী করার কাজে হাত দেই। প্রয়োজনীয় অর্থহাতে না থাকায় ১৯৭০ সনের মার্চ মাসে হাউজ বিল্ডিং ফিনান্স কর্পোরেশন হইতে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করি। ঐ ঋণের টাকা পর্য্যায়ক্রমে পাইয়া জুন মাসের ভিতরই বাড়ীর যাবতীয় কাজ শেষ করিয়া ১/৮/৭০ তাং ভাড়াটিয়া বাড়ী ছাড়িয়া নবনির্মিত বাড়ীতে বসবাস করিতে থাকি। বাড়ী তৈরী করার সময় প্রতি হাজার ১নং ইট ১০০/- (একশত) টাকা, প্রতি বস্তা সিমেন্ট ১০/১১ (দশ এগার) টাকা ছিল। রাজ মিস্ত্রি এবং ভাল কাঠ মিস্ত্রি রোজ ৫/- (পাঁচ) টাকা করিয়া এবং জুগালদারকে প্রতি রোজ ২/- (দুই) টাকা করিয়া দিতে হইত। অন্যান্য উপকরণের মূল্যও আজকালকার তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। বাড়ী করিতে মোট খরচ হইয়াছিল ২৫/২৬ (পঁচিশ ছাব্বিশ) হাজার টাকা।

এক্ষণে পিছনে ফেলিয়া আসা ঘটনার কথা কিছু লিখিতেছি। মানিকগঞ্জ আসার পরপরই বেউথা ঘাটে ধান চাউলের আরত খোলা হয়। ছোট ভাই হোসেন আলী এবং বড় ভাইয়ের বড় ছেলে সিদ্দিক অংশীদার থাকে, তাহাদের কোন মূলধন ছিল না। খাতা পত্র লেখার জন্য একজন সরকার, বেচাকেনার জন্য নিজ গ্রামের তাহেজ উদ্দিন সহ ২/৩ জন লোক, ৩/৪ জন কয়াল এবং নিজ গ্রামের দলিমুদ্দিনকে বাবুর্চি হিসাবে রাখা হইল। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল হোসেন আলী। খুব জাকজমকের সহিত ব্যবসা চলিতে লাগিল। আরও মূলধনের প্রয়োজন তাই পয়লার চকের ১২ (বার) বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা এবং পেনশন বিক্রয় করিয়া ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা অতিরিক্ত ভাবে ব্যবসায় বিনিয়োগ করিলাম।

আমার বাবরবার নিষেধ সত্ত্বেও হোসেন এবং সিদ্দিক ফরিয়াদের নিকট হাজার হাজার টাকার ধান ও চাউল বাকিতে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। নানাভাবে বাহুল্য ব্যয়ও হইতে লাগিল প্রচুর। এইভাবে পুঁজি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল তখন হোসেন এবং সিদ্দিক উভয়েই আমাকে না জানাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল এবং আর ফিরিয়া আসিল না। ঐ সময়ে বিভিন্ন ফরিয়াদের নিকট বাকির পরিমাণ ৩০,০০০/৩৫,০০০ (ত্রিশ পঁয়ত্রিশ) হাজার টাকা ছিল এবং আমাদের নিকট ধান চাউল সরবরাহকারী বেপারীদের পাওনা ছিল ৫,০০০/৬,০০০ (পাঁচ ছয় হাজার) টাকা। পাওনাদারেরা টাকার জন্য আমাকে চাপ দিতে থাকিল কিন্তু বাকি টাকা কিছুই আদায় হইল না। পরে অবশ্য আমি বেপারীদের পাওনা টাকা সমস্তই পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলাম। রাশেদ খাঁ নামক একজন কয়াল কিছুদিন পর তার দেওয়া বাকী ৩০০/- (তিনশত) টাকা আদায় করিয়া আমাকে দিয়াছিল। ইহা ছাড়া আর কোন বাকী টাকাই আজ পর্য্যন্ত আদায় হয় নাই, আর কোন দিন হইবেও না। এই সব কারণেই বাড়ী তৈরী করিও আমাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এক বৎসর পর আমি বাড়ী যাইয়া হোসেন এবং সিদ্দিকের সহিত হিসাবে বসিলাম। হিসাবে বেশ মোটা অংকের টাকা উহাদের নিকট আমার পাওনা দাঁড়াইল। সিদ্দিক

অপেক্ষা হোসেনের নিকট আমার পাওনা অনেক কম ছিল। নগদ টাকা দিতে না পারায় টাকার পরিবর্তে হোসেন আমাকে কিছু জমি দেয়। সিদ্দিক আমার পাওনা টাকার পরিবর্তে এক দাগে ৫০ ডেসিমিল ও অপর এক দাগে ৩৫ ডেসিমিল জমি এবং একটা গাভী দিয়াছিল। এ সবের জন্য কোন দলিল করার কথা আমি চিন্তাও করি নাই তাই ঐ সব দেনা পাওনার কাজ মুখে মুখেই হইয়াছিল। সিদ্দিকের দেওয়া ঐ ৫০ ডেসিমিল জমি আমি সিদ্দিকের পিতার নিকট পূর্বে বিক্রয় করিয়াছিলাম। ঐ জমিটা ফেরৎ পাওয়ার পর অন্য লোকের নিকট বর্গা দিয়াছিলাম কিন্তু অপর ৩৫ ডেসিমিল জমি সিদ্দিকের অনুরোধে তাহারই নিকট বর্গা রাখা হয়। এর পূর্বে হইতেই আমার কিছু জমি সিদ্দিকের নিকট বর্গা দেওয়াছিল।

এরপর সিদ্দিক যখন জমি জমা বিক্রয় করিয়া মা এবং ভাইদের নিয়া বাশাইল চলিয়া যায় তখন ঐ ৩৫ ডেসিমিল জমি আমাকে দিতে অস্বীকার করে। কোন দলিল না থাকায় এবং জমিটা তাহারই দখলে থাকায় আমার আর কিছু করার ছিল না। লোকজন লইয়া বসিলে সিদ্দিক পাওনা টাকার পরিবর্তে আমাকে ঐ জমি দিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং ঐ জমির পরিবর্তে আমাকে নগদ ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা দিবে বলিয়া লোকজনের মোকাবেলা অঙ্গীকার করে। অন্যান্য বাবদেও সিদ্দিকের নিকট ১৪০০/- (এক হাজার চারশত) টাকা আমার পাওনা ছিল। তখন ছিল চৈত্র মাস। সমস্ত টাকাই সে আগামী আষাঢ় মাসে পরিশোধ করিবে বলিয়া উপস্থিত সকলের মোকাবেলা অঙ্গীকার করিয়াছিল। সিদ্দিকের নিকট ঐ আষাঢ় মাস আজ পর্য্যন্তও আসে নাই এবং আর কোন দিন আসিবেও না। খুব সম্ভব ঐ ৫০ ডেসিমিল জমির ফসলের ভাগও আমাকে কোন দিন সে দেয় নাই। তবুও সে সুখে থাক, শান্তিতে থাক, পরম করুণাময়ের দরবারে এই প্রার্থনা করিয়া আমার সব দাবী দাওয়া প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছি। হোসেনের দেওয়া জমি অবশ্য আজও আমার ভোগ দখলে আছে।

স্ত্রীর খালাতো ভাই রাহাতপুর নিবাসী টুকুর পরামর্শ ও প্ররোচনায় লঞ্চ ভাড়া করিয়া আরিচা ঘাটে পরিবহন ব্যবসা করিয়াছিলাম। এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে টুকুই ছিল। নানা কারণে এ ব্যবসায়ও লোকসান দিতে হইয়াছিল।

জীবনে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরুণ বহুবার ভূল করিয়া মাশুল গুণিতে হইয়াছে প্রচুর। সবচেয়ে বড় ভুল নৌকা ডুবি সংক্রান্ত, যাহা পুর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর বড় ভুল হইতেছে পয়লার চকের জমি বিক্রয়। এ ভুলের প্রভাব সুদুর প্রসারী এর জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং নিজেই নিজের নিকট অপরাধী।

শৈশব কাল হইতেই নিজহাতে গাছ গাছরা রোপণ, ছোট খাট শাকশজির বাগান করা এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজন টুকি-টাকি কিছু না কিছু একটা করার অভ্যাস আমার ছিল। কর্মজীবনেও এসবের প্রতিফলন ঘটিয়াছিল স্পষ্টভাবে। অলসভাবে বসিয়া সময় কাটানো

এবং দিবা নিদ্রা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। খাওয়া খাদ্যের ব্যাপারে সব সময়ই সংযমী ছিলাম। কোন সময়েই পেটুকের ন্যায় অতি ভোজন করিতাম না। খুব ভোরে উঠা আমার অভ্যাস ছিল। অবসর জীবনে যতদিন পারিয়াছি গাভী পালন, ফলের গাছ রোপণ এবং ছোট খাট তরিতরকারীর বাগান নিজ হাতে করিতাম, নিজের করণীয় কাজ সম্ভব হইলে নিজেই করিতাম, অন্যকে বিব্রত করিতাম না। সাধ্যমত সাংসারিক ছোটখাট কাজ কর্ম, তাহা যতই নগণ্য হৌক না কেন, আমি তাহা নিজ হাতে করিতে কখনই কোন লজ্জাবোধ করি নাই। এমনকি ঘর তৈরীর প্রয়োজনে নিজ হাতে ইট ভাঙ্গিয়া খোয়াও তৈয়ার করিয়াছি। খোদার রহমতে কর্মজীবনে আমাকে কোন কঠিন রোগে ভুগিতে হয় নাই। আমার বিশেষ পছন্দের কোন খাদ্যবস্তু বা অন্য কিছু নাই।

জীবনের এই দীর্ঘপথ চলার পাথেয় ছিল পিতামাতার চেষ্টার ফসল সামান্য লেখা পড়া, তাহাদের এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমত।

আমার পরিবার

আমার দুই ছেলে ও সাত মেয়ে। অতি সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। বড় ছেলেঃ এ, কে, এম, হারুণ-আল-রশিদ (আবু) বি,এস,সি। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর পরিচালক।

স্ত্রীঃ শামীম আরা (রোজী)। বাড়ী- টাঙ্গাইল। তাহাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।

মেয়েঃ ইমন - নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

চমন - সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী।

ছেলেঃ উল্লাস - বয়স মাত্র ৩ বছর।

২। ছোট ছেলেঃ এ, কে, এম হামিদুর রশিদ ফিরোজ। একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার। মানিকগঞ্জ পৌরসভা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ ইত্যাদির অধীনে ঠিকাদারী কাজ করিয়া থাকে।

স্ত্রীঃ মাজেদা আক্তার (পিনু)। বাড়ী- চাঁদপুর। তাহাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে।

মেয়েঃ টুলটুলী - বয়স ৫ বছরের কিছু বেশী।

ছেলেঃ উচ্ছাস - বয়স ১ বৎসর ৪ মাস।

ইহারা উভয়েই আমার বর্তমান গৃহবন্দী অবসর জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাহাদের সার্বক্ষণিক সহচার্য এবং শিশুসুলভ আচরণে আমি আমার বার্ধক্যজনিত সকল অসুবিধা ভূলিয়া থাকি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

৩। বড় মেয়েঃ রিজিয়া বেগম।

স্বামীঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল, বাড়ী-নাগরপুর।
পরিবার পরিকল্পনার একজন উপ পরিচালক।
তাহাদের তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে।

ছেলেঃ শাহিন - বি এসসি, (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার
সোহেল - জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।
জুয়েল - বি এসসি (ইলেকট্রিক্যাল) ইঞ্জিনিয়ার।

মেয়েঃ পারভিন - বি কম, বিবাহিতা।
জেসমিন - বি এ, বিবাহিতা। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা।

৪। ২য় মেয়েঃ সামছুন নাহার (বি এ)।

স্বামীঃ মোঃ আবুল বাসার, বাড়ী মানিকগঞ্জ।
তাহাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

ছেলেঃ পাভেল - বি এ পাশ, বর্তমানে আইনের ছাত্র।

মেয়েঃ রিনা - সম্প্রতি বি এ, পরীক্ষা দিয়েছে।

৫। ৩য় মেয়েঃ নূরুন নাহার (মিন্টু), বি এসসি।

স্বামীঃ মোঃ মোস্তফা আলী।
তাহাদের মাত্র এক ছেলে।

ছেলেঃ অনুপ - ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্র।

৫। ৪র্থ মেয়েঃ লুৎফুন নাহার (খোকন), বাংলায় বি এ (অনার্স), এম এ।

স্বামীঃ মোঃ আব্দুর রশিদ। বাড়ী-মানিকগঞ্জ, তিনি একজন আইনবিদ।
তাহাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে।

ছেলেঃ সাকিব — অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

মেয়েঃ সেজুতি — তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

৬। ৫ম মেয়েঃ দিল নাহার (টুকী)। ম্যাট্রিক পাশ

স্বামীঃ মৃত আঃ ছামাদ। বাড়ী-পয়লা।
তাহাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে।

মেয়েঃ রীমা - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-গোলের ছাত্রী।
তাহার বিবাহ হইয়াছে বড় মেয়ের বড় ছেলে শাহীনের সহিত।
শান্তা - দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

ছেলেঃ সজীব - ৭ম শ্রেণীর ছাত্র।
১৪/৫/৮৭ইং তারিখে ছামাদের অকাল মৃত্যুর পর টুকী তাহার ছেলেমেয়ে নিয়া আমার সাথে বসবাস করিতেছে।

৭। ৬ষ্ট মেয়েঃ কামরুন নাহার (দোলন), বিএ (অনার্স)। প্রশিকায় চাকুরীরত।
স্বামীঃ কামরুল হাসান। প্রশিকার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
তাহাদের এক ছেলে এক মেয়ে।
ছেলেঃ মৃদুল — ৬ষ্ট শ্রেণীর ছাত্র।
মেয়েঃ প্রিয়তী — তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

৮। ৭ম মেয়েঃ সান্‌জিদা আক্তার (সিমু), বিএ।
স্বামীঃ শেখ মাহ্‌তাব আহ্‌মদ। একজন বিশিষ্ট প্রকাশনী ব্যবসায়ী।
তাহাদের এক ছেলে এক মেয়ে।
ছেলেঃ ময়ূখ-বয়স ৪ বৎসর।
মেয়েঃ মর্মী-বয়স ৩/৪ মাস।
তাহারা ঢাকায় বসবাস করে।

আমি নিজেকে এই কারণে সুখী এবং আনন্দিত বলিয়া মনে করি যে আমার ছেলে মেয়ে এবং ছেলেদের স্ত্রীদের ভিতর কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত নাই। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্পর্ক মধুর।
আমার প্রতি দুই ছেলের স্ত্রীসহ পরিবারের সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। বিশেষ করিয়া ছোট ছেলের স্ত্রী বাড়ীতে থাকে বলিয়া আমার প্রতি তাহার কর্তব্য অনেক বেশী পালন করিতে হয় এবং সে তাহা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে। একারণে আমার বাড়তি দোয়া তাহার অবশ্যই প্রাপ্য। সবারই জন্য আমার হৃদয় নিংড়ানো দোয়া এবং আশীর্বাদ।
বর্তমানে বার্দ্ধক্য এবং হাপানী রোগজনিত কারণে অচলপ্রায় হইয়া সর্বক্ষণ গৃহবন্দী অবস্থায় নিঃসঙ্গ প্রায় জীবনযাপন করিতে হইতেছে। মাঝে মধ্যে অতি আদরের, মাত্র পাঁচ বছর বয়সের নাতনী "টুলটুলী"কে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষেপাইয়া তাহার শিশুসুলভ আচরণ উপভোগ করা ছাড়া অন্যকোন সাংসারিক কাজকর্ম আমার হাতে এখন নাই। দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত কম। ডান চক্ষু দিয়া কিছুই দেখিতে পাই না। বাম চক্ষু অপারেশন করান হইয়াছে তাই চশমার সাহায্যে এক চোখ দিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। হাত কাঁপে, হাতে ভালভাবে সবসময়ে অক্ষর আসেনা তাই বহু স্থানে কাটাছেড়া এবং লেখা অস্পষ্ট হইয়াছে।
জীবন নাট্যের মঞ্চে দাঁড়াইয়া, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের পর সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহ্‌ পাকের অশেষ রহমতে বর্তমান পর্য্যায়ে পৌছিতে সক্ষম হইয়াছি। এই নাটকের যবনিকা পতন কখন হইবে তাহা কেবল একমাত্র সর্বজান্তা আল্লাহ্‌ পাকই ভাল জানেন।

খোদা হাফেজ।

মোঃ হায়াত আলী

১লা বৈশাখ, ১৪০৩

Terasri Kalinarain Institution.

Office of the Headmaster

Terasri, P. O. Ghiar
Dt. Dacca.

Date 20/5/32

I am very glad to certify that Md. Hayat Ali son of Md Dane Mullah of Bhawanipur passed the Matriculation Examination from our school. He is an energetic youngman of good promise. He possesses all the worthy qualities of the head & the heart. He bears an excellent moral character and I hope his merits will be appreciated everywhere. His age at present is 18 years, 7 months. I shall be glad to see him prosper in life.

Md. Abdul Aziz
Headmaster

SAILOJA NANDAN MAHALANOBIS, B.A.

[illegible] Dacca.
[illegible] 32.

Mahammad Hayet Ali son of Mahammad Banu Molla of Bhowanipur, P.S. Daulatpur , Dacca Dist. entered in our Terasri Kalinarain Institution as a student of class IV and passed the Matriculation Examination without any stoppage in any class, [illegible] year. I had every opportunity of personally studying his character and merit. From my personal knowledge of him I can safely say that he possesses high merit and good character which will stand by him in life. I can re--commend him without any hesitation for any post of trust under Govt. or any private body.

S. Mahalanobis

Manager, Terasri Estate &
Secretary, Terasri Kalinarain Institution

আমার বর্তমান প্রজন্ম এবং অনাগত প্রজন্মের
অবগতির জন্য আমার এ প্রয়াস।
অনাগত দিনে আমার উত্তরসূরী
যাহারা জীবনের কলতানে মুখরিত হইবে
তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের জীবনের
এইসব কথা জানিয়া
পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হইবে বৈকি।
তাই আজ জীবনের অপরাহ্নে বসিয়া
স্মৃতিচারণ করিতেছি পূর্বাহ্নের।